অয়ন

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ ▫ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত : ১৯৬৭

।। দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ।।

সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি বর্ষ

২০১৭ - ২০১৮

GOLDEN JUBILEE COMMEMORATIVE
State Level Seminar
on
GST : The New Laws in India and its Compliance
Monday, 11th September, 2017
Organised By

GOLDEN JUBILEE COMMEMORATIVE
State Level Seminar
on
GST : The New Laws in India and its Compliance
Monday, 11th September, 2017
Organised By

মুর্শিদাবাদ জেলা আন্তঃ কলেজ
ক্রীড়া, ফুটবল ও খো-খো প্রতিযোগিতা-২০১৭-২০১৮

Organised By
Department of Commerce, DUKHULAL NIBARAN CHANDRA COLLEGE
Aurangabad, West Bengal, Pin: 742201

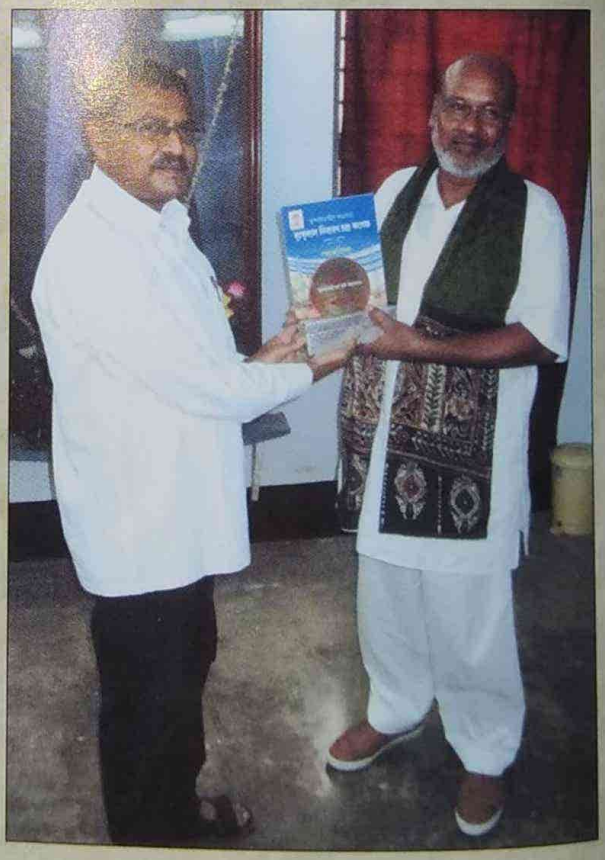

অয়ন

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ ❑ মুর্শিদাবাদ

২০১৭ - ২০১৮

সম্পাদনা

অধ্যাপক সাধন কুমার দাস

পত্রিকা উপসমিতির সহযোগী সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার দে

অধ্যাপক মহ: সাবলুল হক

অধ্যাপক ঈশান আলি

অধ্যাপক জয়ন্ত মণ্ডল

অধ্যাপক একলাচ মণ্ডল

Introduction

Our Ayan this year footstepped into 52nd year and continuing the path or rout of expression. As we know 'Ayan' is the rout and motion of the Star Sun of our Solar Universe. Through AYAN, we all represent ourselves, our thought, culture, values, reflection etc with language. Its a medium of our college and endeavoured to picturise the activities we organised, courses offered, during the academic year, the teacher-students-non-teaching relations practiced and grown, the knowledge rearing and harvesting for the better future and self-development. Our vision is to enrich ourselves with higher education with a mission to impart knowledge for empowerment. Our theme 'Knowledge is Power' (জ্ঞানই আলো). In this way we are to power ourselves with exchange of feelings, knowledge, culture, values, desire, pleasure, performances of life, Ayan, the mirror through which we like to see and measure the change, if any, that we all have contributed for the betterment of our society, humanity, tollerance, co-existence with a larger aim of our country and universe.

I am fortunate enough for being attached myself, in any way during my tennure of 33 years of the publications. I, on behalf of all community of the college, administration and administered, express my heartfelt gratitude to all my colleagues and students, for giving their valuable time to this publication and made possible the design, writting, proof reading and printing in due time.

I, also thanks the guardians, parents, education lovers and both the State and Central Governments, through the Higher Education Department Govt of West Bengal, MHRD & UGC, Govt. of !ndia, for day to day guidance, directions, financial support and grant-in-aid.

CA Nikhilendu Bikash Das
(2017-18)

সম্পাদকীয়

একটি বড় সংকটকাল অতিবাহিত করছি আমরা। মূল্যবোধে সংকট। প্রযুক্তির দুনিয়া আমাদের সামনে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো এনে দিয়েছে ভোগ্যপণ্যের অফুরন্ত সম্ভার। জীবনের আয়ু তো সীমাবদ্ধ। আর এইটুকু জীবনে হাতের মুঠোয় সব চাই, আর এক্ষুণি চাই। এই উদগ্র কামনা থেকে জন্ম নিচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, বেপরোয়া মানসিকতা। পারিবারিক সম্পর্কগুলো আগের চেয়ে শিথিল হয়েছে অনেক বেশি। একই কারণে সামাজিক সম্পর্কগুলোও আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে। পথে ঘাটে আর্ত বিপন্ন মানুষের দিকে আমরা ফিরেও তাকাচ্ছি না। অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা-মাকে ফেলে আসছি বৃদ্ধাশ্রমে, যেন-তেন-প্রকারেণ তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছি। সমাজে বেড়ে যাচ্ছে খুন-জখম, ধর্ষণ ও নানান ধরণের দমন-পীড়ন।

এই হতাশার অন্ধকারে একমাত্র আলোর প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠতে পারে ছাত্রসমাজ। সমাজ যখন দিগ্‌ভ্রান্ত, মানুষ যখন পথভ্রষ্ট, তখন পথের দিশা দেখাতে যুগে যুগে এগিয়ে এসেছে ছাত্রসমাজ। মূঢ়তার অচলায়তন তারাই তো ভাঙে, তারাই তো নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। সেই স্বপ্নের ছোঁয়া লাগে আমাদের সাহিত্য ভাবনায়। উন্নত মনন, উচ্চ চিন্তা, গভীর অনুভূতির প্রকাশক্ষেত্র হল সাহিত্য। তাই ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই প্রতি বছর 'অয়ন' তার ডালি সাজিয়ে দেয়। আমাদের সম্মিলিত চিন্তার প্রতিফলন অয়নের পাতায় প্রতি বছর এভাবেই ঘটে চলেছে।

২০১৭

আমরা শোকসন্তপ্ত

সুনীতি চট্টরাজ (রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)
গীতা সেন (অভিনেত্রী)
ওম পুরী (অভিনেতা)
বনশ্রী সেনগুপ্ত (সঙ্গীত শিল্পী)
কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সঙ্গীত শিল্পী)
রজার মুর (অভিনেতা)
ডা. কল্যাণ মুখোপাধ্যায় (বিশিষ্ট চিকিৎসক)
শোভা সেন (অভিনেত্রী)
কুন্দন শাহ (চিত্র পরিচালক)
গোপীনাথ রায় (ভাস্কর)
রাম মুখার্জী (প্রযোজক ও পরিচালক)
রীতা কয়রাল (অভিনেত্রী)
প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী)
কালাচাঁদ দরবেশ (লোকশিল্পী)
শশীকাপুর (অভিনেতা)
পার্থ মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত শিল্পী)
জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (অভিনেতা)
জ্ঞান সিং সোহন পাল (রাজনীতিবিদ)
সুলতান আহমেদ (রাজনীতিবিদ)
গিরিজা দেবী (শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী)
কিশোরী আমোনকর (শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী)
স্বামী আত্মস্থানন্দ (বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ)

'বঙ্গবিভূষণ' প্রাপ্তির পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়

আমরা গর্বিত

বঙ্গবিভূষণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
নাট্যকার চন্দন সেন দীনবন্ধু পুরস্কার।
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ফ্রান্সের সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার'
সমাজসেবী তুষার কাঞ্জিলালকে ডক্টরেট অব সায়েন্স
আফসার আহমেদ লাভ করলেন ২০১৬-র আকাদেমি পুরস্কার।
প্রথম অসামরিক বাঙালি সত্যরূপ সিদ্ধান্তের সপ্তশৃঙ্গ জয়।

আমরা সহমর্মী

হীরাখণ্ড এক্সপ্রেস বেলাইন। মৃত ৩৯।
হো চি মিন সরণির হোটেলে আগুন। মৃত ২।
মিশরের ২ গির্জায় বিস্ফোরণ। হত ৪৫।
ভদ্রেশ্বরে জেটি ভেঙে মৃত্যু ১৩।
দার্জিলিঙে অশান্তির আগুন।
অমরনাথ যাত্রায় বাস দুর্ঘটনা। মৃত ১৬।
উৎকল এক্সপ্রেস বেলাইন। মৃত ২০।
মেক্সিকোয় ভূমিকম্পে মৃত ২৪৮
মিশরের মসজিদে রক্তগঙ্গা। হত ২৩৫।

ভদ্রেশ্বরে জেটি দুর্ঘটনায় চলছে উদ্ধার কাজ।

অধ্যক্ষ, অধ্যাপকমণ্ডলী ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অধ্যক্ষ

সিএ নিখিলেন্দু বিকাশ দাস, এম. কম, এম ফিল, এলএলবি

অধ্যাপকমণ্ডলী

- বাংলা বিভাগ
  - ১। সাধন কুমার দাস, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। ড. সুনীল কুমার দে, এম.এ. পি-এইচ.ডি
  - ৩। [শূন্য]
  - ৪। অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। একলাচ মণ্ডল, এম.এ., এম ফিল (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৬। মাসুদ রানা, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- ইংরাজি বিভাগ
  - ১। ঈশান আলি, এম.এ., এম. ফিল. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। রাজকুমার হালদার, এম. এ., এম. ফিল.
  - ৩। অন্তরা সাহা, এম.এ., এম ফিল (চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপিকা)
  - ৪। মহ: আরিফ নাদিম, এম.এ., (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। মাবুদুল ইসলাম, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৬। মহ: তোফিজুল ইসলাম, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- ইতিহাস বিভাগ
  - ১। মহ: সাবলুল হক, এম.এ., বি.এড (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। শ্রীমন্ত দাস এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৩। শৈলেশচন্দ্র রায় এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৪। মহ: নাজমুল্লা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। মহ: রফিকুল ইসলাম, এম.এ. এম.এড (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৬। মহ: মসিউর রহমান, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- অর্থনীতি বিভাগ
  - ১। গোপাল চন্দ্র রায়, এম.এ.
  - ২। ড. সম্প্রীতি বিশ্বাস, এম.এ., এম. ফিল., পি-এইচ.ডি
- দর্শন বিভাগ
  - ১। পরিতোষ বর্মন, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। [শূন্য]
  - ৩। সুমন্ত ঘোষবাগ এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৪। সঞ্জয় পাল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। নন্দিতা সরকার (মণ্ডল), এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৬। সুধন দাস, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- সংস্কৃত বিভাগ
  - ১। জয়ন্ত মণ্ডল, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। সুজয় কুমার পাল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৩। মীনাক্ষী লাহা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৪। অন্তরা সাহা, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপিকা)
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
  - ১। [শূন্য]
  - ২। কৃষ্ণা রায়, এম.এ., এম ফিল (বিভাগীয় প্রধান)
  - ৩। শিঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), এম.এ.
  - ৪। [শূন্য]
  - ৫। পম্পা ব্যানার্জী, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৬। নসরৎ বেগম, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৭। সালাউদ্দিন সেখ, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৮। মরিয়ম রেজা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
- শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ
  - ১। কৌশিক ভক্ত, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। সনাতন সরকার, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৩। অমর মণ্ডল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৪। দেবাশিস মণ্ডল, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৫। অমৃতা দাস, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপিকা)

- বাণিজ্য বিভাগ
  - ১। সিএ নিখিলেন্দু বিকাশ দাস, এম.কম., এম ফিল, এলএলবি (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। ড. শ্যামলকুমার মণ্ডল, এম.কম., এম ফিল, পি-এইচ.ডি
  - ৩। [শূন্য]
  - ৪। মাধব কুমার বিশ্বাস, এম.কম.
  - ৫। সুখেন মণ্ডল, এম.কম.
  - ৬। তোফাজ্জেল আহমেদ, এম.এ., এল.এল.বি.
- পরিবেশবিদ্যা বিভাগ
  - ১। হাসনাহারা খাতুন, এম.এসসি. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
- শরীরশিক্ষা বিভাগ
  - ১। হুমায়ুন কবীর, এম.পি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ২। মনোরঞ্জন প্রামাণিক, এম.পি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
- রসায়ন বিভাগ
  - ১। [শূন্য]
  - ২। সুমিত সিংহ, এম.এসসি. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৩। রাজিয়া সুলতানা, এম.এস.সি. (অতিথি অধ্যাপিকা)
  - ৪। সুলতান সেখ, এম.এসসি. (অতিথি অধ্যাপক)
- পদার্থবিদ্যা বিভাগ
  - ১। ড. অমিতলাল ভট্টাচার্য, এম.এস-সি, পি-এইচ.ডি
  - ২। রহিমা খাতুন, এম.এসসি
- গণিত বিভাগ
  - ১। [শূন্য]
  - ১। প্রাণকৃষ্ণ দাস, এম.এসসি. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ২। বেগম সামসুন্নেহার, এম.এসসি (অতিথি অধ্যাপিকা)
- উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
  - ১। অনুপ কুমার সরকার, এম.এসসি.
  - ২। সুচন্দা চক্রবর্তী, এম.এসসি. (অতিথি অধ্যাপিকা)
- প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
  - ১। [শূন্য]
  - ২। মহ. নাজির হোসেন, এম.এসসি. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৩। মনস্বিতা ঘোষ চৌধুরী, এম.এসসি (অতিথি অধ্যাপিকা)
  - ৪। পৃথ্বীশ সরকার, এম. এসসি. (অতিথি অধ্যাপক)
- ভূগোল বিভাগ
  - ১। শুভময় কুণ্ডু, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ২। কৌশিক বারিক, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৩। রাকেশ মণ্ডল, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৪। গৌরহরি মণ্ডল, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- আরবী বিভাগ
  - ১। আবু সালিম, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- গ্রন্থাগার
  - ১। মহ: নুরুল ইসলাম, এম.কম., এম এল অ্যান্ড আই এস সি
  - ২। [শূন্য]
  - ৩। স্বাধীন রজক, বি.কম (সহায়ক)
- কার্য্যালয় বিভাগ
  - ১। মহ: হরোজ আলি, বি.এ.অনার্স (হেড ক্লার্ক)
  - ২। [শূন্য] (অ্যাকাউন্ট্যান্ট)
  - ৩। [শূন্য] (ক্যাশিয়ার)
  - ৪। [শূন্য] (অফিসিয়েটিং স্বাধীন রজক) (করণিক)
  - ৫। [শূন্য] (অফিসিয়েটিং ধ্রুব বারিক) (টাইপিস্ট)
  - ৬। ধ্রুবকুমার বারিক, এইচ.এস. (সহায়ক)
  - ৭। নন্দকিশোর সিং (দারোয়ান)
  - ৮। অশোক কুমার রায় (সহায়ক)
  - ৯। অধীন রজক (গার্ড)
  - ১০। মইদুল ইসলাম, বি.এ. (ইলেকট্রিসিয়ান কাম কেয়ারটেকার)
- ছাত্রাবাস
  - ১। অনুপ কুমার সিংহ (সহায়ক)
  - ২। প্রশান্ত দে (সহায়ক), ৩। মহ: মন্টু সেখ (কুক)
- ক্যাজুয়াল অফিস স্টাফ
  - ১। মজিবুর রহমান, বি.কম. (ক্লার্ক)
  - ২। গৌতম পাল, এইচ. এস (জিমন্যাসিয়াম)
  - ৩। সুদীপ্ত দাস, বি. এ. (লাইব্রেরি সহায়ক)
  - ৪। আনোয়ার হোসেন, বি.কম. পিজিডিবিএম (অফিস সহায়ক)
  - ৫। মহ. খালেক হোসেন, এইচ. এস (অফিস স্টাফ)
  - ৬। সুজিত জমাদার (সুইপার)
  - ৭। দীপ বিশ্বাস, এম. পি. (ল্যাব অ্যাটেন্ড্যান্ট)
  - ৮। সীতা সিংহ, এম. পি. (লেডি অ্যাটেন্ড্যান্ট)
  - ৯। কৃষ্ণ রজক, এইচ.এস (সুইপার)

D.N. College Computer Centre

(Affiliated by : W.B. State Council of Technical Education, Govt of West Bengal)

Sponsored by

G.D. Charitable Society
Aurangabad, Murshidabad

1. Supriya Sengupta (Facalty-in-charge)
2. Somnath Guha (Facalty)
3. Raju Barman (Lab-Attendant)

দুখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ডা: রাজেশ খান্না, ডি. এইচ এম এস (ক্যাল) (আংশিক সময়)

পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে

সম্পাদক একজন সংকলক মাত্র। কিন্তু সংকলনই কি শেষ কথা? নানান গাছ থেকে পুষ্পচয়ন করার পর পুষ্পস্তবক যিনি রচনা করেন। তাকেও একজন জহুরী হতে হয়। শিল্পী হতে হয়। কীটদষ্ট ফুল বেছে বেছে বাদ দিতে হয়, শিল্পী হতে হয়। কীটদষ্ট ফুল বেছে বেছে বাদ দিতে হয়, ফুলের বৈচিত্র্য অনুযায়ী স্তবকের মধ্যে তার বিন্যাস ঘটাতে হয়, তারপর স্তবকটি একটি নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেটা ফুলের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু।

একজন সম্পাদকেরও দায় থাকে এতখানিই। কলেজ-পত্রিকার ক্ষেত্রে এই দায় যেন আরো বেশি। কেন না, এখানে পড়ুয়াদের মূল্যবোধের বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। মফঃস্বল এলাকার কলেজ বলে বিষয়টি আরো সেনসেটিভ। এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই বিড়িশ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা থেকে পড়তে আসে। অনেক ছাত্রছাত্রীর পরিবার দারিদ্রলাঞ্ছিত। ফলে স্কুলজীবন থেকেই তাদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতিবোধের অভাব লক্ষ করা যায়। নোটকেন্দ্রিক পড়াশোনাতে তারা ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে সাহিত্যের যে বিস্তীর্ণ জগৎ, সেই জগতের খবরও তারা খুব একটা রাখে না। তাছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাম্প্রতিককালে তাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে শুদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার দিকে তারা তাদের আগ্রহ ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে।

কাজেই, পত্রিকার জন্য লেখা চেয়ে যখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়, তখন একশ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপরিমেয় উৎসাহ লক্ষ করা যায়। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে পর্যাপ্ত লেখা জমা দেয়। কিন্তু সেই লেখাগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে বিষম বিপদে পড়তে হয়। সঠিক সাহিত্যবোধ গড়ে না ওঠায় সেই লেখার অধিকাংশই হয় স্থূল রুচির। বিষয়ের প্রতি আন্তরিকতা থাকলেও, তার প্রকাশকে তারা সুচারু করে তুলতে পারে না। ফলে সেগুলি মুদ্রিত হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে অধিকাংশ লেখাকেই বহু চেষ্টায় সম্পাদনা করেও মুদ্রণপযোগী করা যায় না।

সাহিত্য সৃষ্টির মূলে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে। একটি হল গ্রহণের ক্ষমতা, অন্যটি প্রকাশের ক্ষমতা। আমাদের হৃদয়ের চারপাশে কিছু জানালা থাকে, যে-জানালা দিয়ে বাইরের জগতের হাসিকান্না, আলো-অন্ধকার, সুখদুঃখ আমাদের অন্তরলোকে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তুবাদী মানুষ আছে। যারা আত্মকেন্দ্রিক। তাদের হৃদয়ের জানালাগুলি অধিকাংশই বন্ধ থাকে। অনন্ত উদার আকাশের মুক্তির গান তাদের হৃদয়বীণার তারে অণুরণিত হয় না। ফলে তাদের গ্রহণক্ষমতা সাবলীল হয়। আর গ্রহণের

ক্ষমতাযদি না-থাকে, তাহলে প্রকাশের প্রশ্নই আসে না।

এবার ধরা যাক, গ্রহণের ক্ষমতা যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা কীভাবে এগোতে থাকে? বাইরের জগতের যা-কিছু উপাদান, মন তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করে না। সেখানেও থাকে নির্বাচন। প্রাথমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মন তার রুচি ও মর্জি অনুযায়ী বাহ্যিক উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে। তারপর তা প্রকাশ করার পালা। এই প্রকাশের ক্ষেত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, 'কী বলছি', তার চেয়ে 'কেমন করে বলছি' বিষয়টি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রকাশের ক্ষেত্রে যে-বিষয়টি সবচেয়ে মনে রাখার মতো, তা হলো ব্যক্তিকে নিত্যকালের উপাদানগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। এই কাজটি সবচেয়ে কঠিন কাজ নিত্যকালের বোধ তৈরি হয় কিছুটা সহজাতভাবে আর কিছুটা দীর্ঘকালীন সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে। এই ঘষামাজাটা একদিনে হয় না। দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি মার্জিত রুচিবোধ গড়ে ওঠে। সেই মার্জিত পরিশীলিত মন-ই নিত্যকালের উপাদানগুলিকে চিনিয়ে দিতে পারে।

মনের মধ্যে সংগৃহীত উপাদানগুলির মধ্যে থেকে সর্বজনের উপযোগী (রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বিশ্বমন' বলেছেন) উপাদানগুলিকে নিজস্ব নির্মাণশৈলীর সহায়তায় একজন লেখক সাহিত্যের পাত্রে পরিবেশন করেন। তখন ব্যক্তিগত অনুভব হয়ে ওঠে সর্বজনীন অনুভব।

এই জটিল প্রক্রিয়াটি তো একদিনে রপ্ত হয় না। সুতরাং সেই প্রতিবেশ, পরিবেশ, পরিস্থিতি আমাদের শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে অনেকেই পায় না বলে তারা প্রকাশের জায়গাটিতে অপটু থেকে যায়। এই অপটু রচনার স্তূপ থেকে আমাদের বেছে নিতে হয় সেই সমস্ত লেখা, যা কিছুটা সর্বসাধারণের পাতে দেবার যোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদককে এতটাই কলম চালাতে হয় যে শেষ পর্যন্ত মূল লেখাটির আদলই আর থাকে না।

তারপর সেই লেখা প্রেসে যায়। সেই পর্বে থাকে দু'তিন দফা প্রুফ দেখার পালা। এই কাজটিও খুব যত্নের সঙ্গে করতে হয়, তা না হলে চূড়ান্ত মুদ্রণে অনেক মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যায়। শুধু প্রুফ দেখা নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বছরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি নির্বাচন করতে হয়, যথাযথ প্রচ্ছদের দিকেও মনোযোগী হতে হয়। তারপরেও যে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যায় না, তা নয়। তার জন্য সমালোচকেরা তো সবসময় খড়্গহস্ত। আর এই সমালোচনার খাঁড়া মাথা পেতে নিতে হয় সম্পাদককেই।

এই সমস্ত পরিশ্রম, সার্থকতা ও ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যর্থতা নিয়েই ২০১৭-১৮-র বার্ষিক কলেজ পত্রিকা 'অয়ন' প্রকাশিত হল। সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সাধন কুমার দাস
সম্পাদক

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

মেঘ পাহাড় আর জলপ্রপাতের রাজ্যে (ভ্রমণ)	অধ্যাপক সাধন কুমার দাস ১১
বঙ্গ সংস্কৃতির সেকাল ও একাল	অধ্যাপক ড. সুনীলকুমার দে ১৪
কণা জগৎ ও তাদের কার্যকলাপ	অধ্যাপক নিশিকান্ত পাল ৩৩
ইতিহাসের পৃষ্ঠায়	অধ্যাপক অজিত চৌধুরী ৩০
ধর্ষণ, খুন ও প্রতিরোধ	মোজাম্মেল হক ২৯
সন্ন্যাসী নিমাই	মোহন কুমার দাস ৩৯
Blue Jets – The Light of hope and anxiety	Prof. Dr. Amit Lal Bhattacharya 38
Two Hundred Years.....Field of West Bengal	Prof. Dr. Kishore Kr. Roy Choudhury 36

গল্প

ঠিক ভুল	বিপাশা গোস্বামী ২০
ভূত বাংলো	সুশান্তিকা চৌধুরী ৩২

কবিতা

শূন্যতা	সুভাশিষ দাস ২৩
আমরাও পারব	দেবারতি সিংহরায় ২৩
বনের পাখি	লক্ষ্মীমণি সরকার ২৩
না থাকার সেই দিনগুলিতে	প্রিয়াংকা দাস ২৩
পরীক্ষা	আবিদা সুলতানা ২৪
বাবার প্রতি	পারমিতা দাস ২৪
রামকৃষ্ণদেব	সুরাজ আলম ২৪
কবিতায় আমি	মানজারুল ইসলাম ২৪
শুধু তুমি	ওয়াসিম আকরাম ২৫
লুকানো স্বপ্ন	অনিতা দাস ২৫
হয়তো বা	চৈতালী প্রামাণিক ২৫
স্মৃতিগুচ্ছ	সুস্মিতা সরকার ২৬
আশা	শ্বেতা কর্মকার ২৬
তুমি চলে গেলে	মানজুলা খাতুন ২৬
বেলা যায়	নারায়ণ বিশ্বাস ২৬
আয় বসন্ত	রিমি মণ্ডল ২৭
শপথ	জাসমিগ ইসলাম ২৭
বৃদ্ধাশ্রম থেকে	তনুশ্রী দাস ২৭
পরিবেশ ও মানুষ	আশিক ইকবাল ২৭
অথৈ জলে নিথর দেহ	মোবারক হোসেন ২৮

কলেজ পরিচালন সমিতি

(১.৪.১৮ থেকে)

১।	জনাব মোস্তাক হোসেন	সভাপতি
২।	সিএ নিখিলেন্দু বিকাশ দাস	সম্পাদক
৩।	জনাব হুমায়ুন রেজা সম্পাদক জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন	দাতা সদস্য
৪।	শ্রী সমীর কুমার দাস পরিচালক এমবিএম কোং	দাতা সদস্য
৫।	জনাব এস. এম. ইউসুফ আলি	গভ. প্রতিনিধি
৬।	শ্রীগৌরীশংকর পাল	গভ. প্রতিনিধি
৭।	শ্রীদীপক কুমার দাস	WBSCHE প্রতিনিধি
৮।	অধ্যাপিকা ড. শ্রীমতী সুতপা দত্ত	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
৯।	অধ্যাপক পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
১০।	অধ্যাপক ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল	শিক্ষক প্রতিনিধি
১১।	অধ্যাপক মহ. সাবলুল হক	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২।	অধ্যাপক অনুপ কুমার সরকার	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩।	জনাব মহ. হরোজ আলি	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১৪।	প্রিয়াংকা দাস	ছাত্র প্রতিনিধি

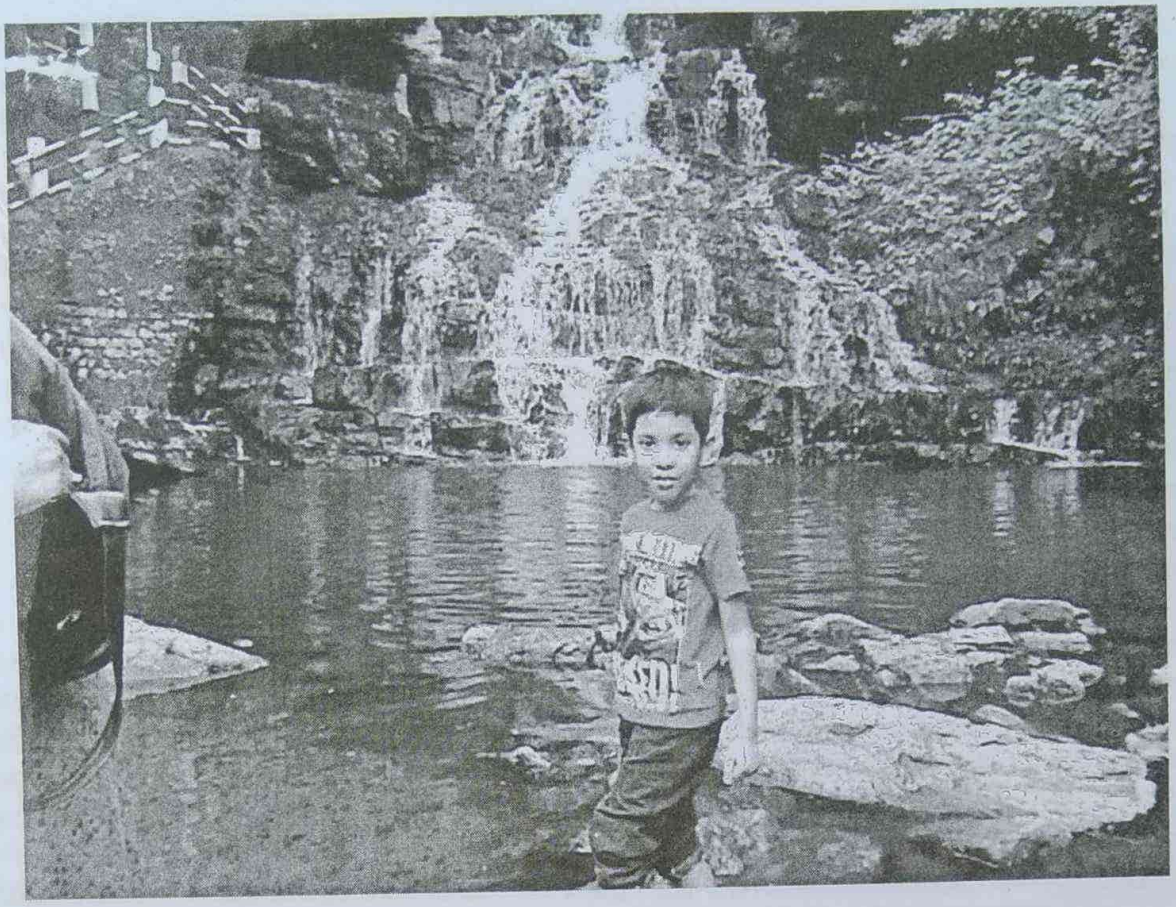

মেঘ পাহাড় আর জলপ্রপাতের রাজ্যে

অধ্যাপক সাধন কুমার দাস

যেন মেঘের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পৃথিবীর ছাদের উপর এক অপরূপ স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছে যাওয়া। সেই স্বপ্ন সত্যি হল এবার। দমদম বিমানবন্দর থেকে জেট এয়ারওয়েজের ডানায় ভর করে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের সমুদ্র সাঁতরিয়ে পৌঁছে গেলাম গুয়াহাটিতে। বিমানের জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ গাছগাছালি আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নানারঙের ঘরবাড়ি। গুয়াহাটি বিমানবন্দরে নেমে আমাদের চারদিনের প্যাকেজ ট্যুরের জন্য ব্যবস্থা করা একটি গাড়িতে চ'ড়ে প্রথমেই গেলাম কামাখ্যা মন্দির। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি চড়াই পথে বেশ কিছুটা উঠে গিয়ে এই সতীপীঠ। আর পাঁচটা তীর্থস্থানের মতোই এর চরিত্র। তবে পাণ্ডাদের পীড়াপীড়ি নেই। প্রশস্ত চত্বর পেরিয়ে লম্বা রেলিং দেওয়া বারান্দায় পুজো দেওয়ার লাইন। ঘন্টাদেড়েক লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দিয়ে নেমে এসে একটি হোটেলে আমরা খেলাম। তারপর চললাম ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপের সন্ধানে— যেখানে সুন্দর একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর ততোধিক সুন্দর উমানন্দ মন্দির। ইংরেজরা এই উমানন্দ দ্বীপের নাম দিয়েছিল ময়ূর দ্বীপ। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার কাম গাইড বর্মনদা বললেন যে এটি নাকি বিশ্বের 'স্মলেস্ট আইল্যান্ড'।

রাত্রিটুকু আমরা গুয়াহাটির হোটেলে থেকে সকালবেলা রওনা হলাম শিলং-এর উদ্দেশ্যে। অসম পেরিয়ে মেঘালয়ের দিকে ছুটছে আমাদের গাড়ি। দিসপুর পেরিয়ে পল্টন বাজার থেকে দশ কিলোমিটার দূরে খানা পাড়া বর্ডার পেরিয়ে জোড়াবাট। ফোর লেনের চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বর্মনদা বললেন,'এই যে দেখছেন এই রাস্তার বাঁদিকের টু লেন অসমে পড়ে, ডিভাইডারের ডানদিকের রাস্তাটা মেঘালয়। অসম বন্ধের দিন সীমানাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বাঁদিকের রাস্তা শুনশান, ডানদিকের গাড়িঘোড়ার ব্যস্ততা। বেলা ৯টার দিকে আমরা পৌঁছালাম উমিয়াম লেক। স্থানীয়রা বলে বড়াপানি লেক। প্রকৃতির কোলে ভারতের সেরা এই গ্রামটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের নীল জল দিয়ে যেন ধুয়ে দিয়েছে কেউ। এখানেই রয়েছে উমিয়াম হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট। চারদিকে পাইনের জঙ্গল। দুপুরের আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম 'পূর্বভারতের স্কটল্যান্ড' শিলং শহরে। মেঘালয়ের রাজধানী। এখানে আমরা দেখলাম শিলং ভিউ পয়েন্ট (৬৪৫০ ফুট), পাঁচতলা ডন বসকো মিউজিয়াম। উত্তরপূর্ব ভারতের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব সংগ্রহশালা। ১০০ টাকা টিকিট হলেও দেখার পর পয়সা উসুল হয়ে যায়। ডন বসকো ফুড গ্যালারিতে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম।

দু'পাশে পাইনের ঘন জঙ্গল দেখতে দেখতে শিলং এর রাজভবন, ওয়ার্ডস্ লেক, লাইমুখরাতে একটা বড় চার্চ, নোংথুমাই পেরিয়ে হ্যাপি ভ্যালি এবং শীতার্ত সন্ধ্যার আবছা কুয়াশায় শিলং শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এক নীল নির্জন উপত্যকায় স্যুইট ফলস্ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। জঙ্গলের ভিতর থেকে শুভ্র সুন্দর এক জলধারা অরণ্য সুন্দরীর শুভ্র আঁচলের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে অঝোরে লুটিয়ে পড়েছে গভীর খাদের দিকে। রাত্রে আমরা থাকলাম লুমপ্রিং পাহাড়ের উপর 'ডিউ ড্রপ ইন' হোম স্টে তে। ঘরোয়া খাবার— রুটি, ভাত, সবজি, ভাজা। রাতের খাওয়ার পর বর্মনদা আমাদের 'ডিউ ড্রপ ইন' -এর দোতলার ব্যালকনি থেকে অনেক নিচে পাহাড়ের ঢালে আলো ঝলমল, অপরূপা শিলং শহরকে দেখালেন। মন ভরে গেল এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে। হোটেলের ঘরে শুয়ে শুয়ে সারারাত ধরে শুনেছি বৃষ্টি পড়ার ঝরঝর শব্দ। ভাবছিলাম, পুরদিনের বেড়ানোটা বোধ হয় মাটি হয়ে গেল। কিন্তু সকালে উঠে দেখি, বাইরে বৃষ্টির চিহ্ন নেই। জিজ্ঞেস করতেই হোম স্টে-র মালিক তরুণবয়সী 'গ্রান্ট' (গারো থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান) আধো হিন্দি আধো ইংরেজিতে বলল যে আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ি খরস্রোতা ঝর্ণা বইছে, রাত্রে আমরা সেই জলপ্রবাহের শব্দকেই বৃষ্টির শব্দ বলে ভুল করেছি।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করার পর শিলংকে টা টা করে আমরা রওনা হয়ে গেলাম চেরাপুঞ্জির দিকে। তবে তার আগে বর্মণদা আমাদের নিয়ে গেলেন রিলবং এলাকায়। এখানে আছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য দুটি বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ তিনবার শিলঙে আসেন। ১৯১৯-এ ব্রুকসাইড বাংলোয় বসে তিনি লেখেন তাঁর কালজয়ী কাব্যোপন্যাস 'শেষের কবিতা'— যে বাড়িটি এখন সরকারি বাংলো, যেখানে রবীন্দ্রসংগ্রহশালার সামনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশাল স্ট্যাচু। আরেকটি বাড়িতে ছিলেন তিনমাস, ১৯২৩ সালের এপ্রিল, মে জুন। জিৎভূমি বাংলোর এই বাড়িতে বসে কবি লেখেন 'রক্তকরবী'। এই বাড়িটি বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানায় অন্যলোকের অধিকারে। রবীন্দ্রনাথ শেষবার শিলং-এ আসেন ১৯২৭-এ।

চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে চির পাইন, ক্রিসমাস পাইন, ফুলভরা কাঞ্চনগাছের অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে গেল। এই নির্জন পার্বত্যপ্রদেশে প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভার যেন উপুর করে ঢেলে দিয়েছেন ভগবান। বেলা ১০ নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম এলিফ্যান্ট ফলস্-এ। উপরে নরম সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে ছোট ছোট দোকান। ৩৭টি সিঁড়ি বেয়ে আমরা নিচে নেমে গেলাম। রেলিংঘেরা প্রশস্ত চত্বরে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে ঝরে-পড়া এলিফ্যান্ট ফলস দেখে মন ভরে গেল। ছবি তোলা হল অজস্র। উপরে উঠে আসতেই বর্মণদা বললেন, 'একদম নিচে গিয়েছিলেন তো?' 'একদম নিচে মানে?' 'আরে দাদা, আসল জলপ্রপাতটা তো আরও অনেক নিচে!' মুহূর্তের মধ্যে কারোর অপেক্ষা না ক'রে আমি একা আবার নামলাম। ৩৭টির পরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পিচ্ছিল সংকীর্ণ সিঁড়ি নেমে গেছে আরও ১৪৪ ধাপ। তারপরে যা দেখলাম, তা 'জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' নেমে যাওয়া সিঁড়ির পাশ দিয়ে এক প্রশস্ত বিশাল জলপ্রবাহ দুর্দমনীয় বেগে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাদা ফেনার অপরিমিত উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। এত কাছে থেকে আর কোনও জলপ্রপাতকে আমি দেখি নি। খাসিয়া ভাষায় এই ঝরণার নাম— 'কা খাসাইদ লাই পাতেং খোসিউ' অর্থাৎ 'তিন ধাপের ঝরণা'। হাতির আকারের একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়ে এই ফলস্ ঝরে পড়ছে দেখে ইংরেজরা নাম দেন এলিফ্যান্ট ফলস। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে হাতির আকারের প্রস্তর খণ্ডটি ভেঙে যায়। কিন্তু 'এলিফ্যান্ট' নামটি আজও থেকে গেছে।

এরপর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। দুপুরের আগে সান দাউ ভিউ পয়েন্ট। ডানদিকে খাড়া পাহাড়, বাঁদিকে গভীর খাদ। ৩৫০টি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলে সবুজ উপত্যকার গায়ে আরেক নির্জন অথচ মুখর জলপ্রপাত। ২০০টি সিঁড়ি নেমে যাবার আর সাহস হল না, যদি উঠতে না পারি!! পাহাড়ি গ্রাম, চুনাপাথরের পাহাড়, সবুজ উপত্যকা, ন্যাশপাতি গাছ, আনারসের খেত, তেজপাতার জঙ্গল আর চড়াই-উৎরাই পথ পেরোতে পেরোতে বর্মণদা দেখালেন— এই লাইম স্টোনের পাহাড় ভেঙে কীভাবে সিমেন্ট কোম্পানিগুলি প্রসেসিং করছে চুনাপাথরকে। আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছি আমরা। কুয়াশার মতো মেঘে আবছা হয়ে আছে দিগন্ত পর্যন্ত। গাছপালা কমে যাচ্ছে। প্রায় অনেকটা সমতলভূমির উপর ছোটো ছোটো গাছে ঘেরা 'সাহারারিম' গ্রাম পেরিয়ে দুপুরবেলা আমরা পৌঁছে গেলাম চেরাপুঞ্জিতে। এখানে কোথাও কোনও সাইনবোর্ডে 'চেরাপুঞ্জি' কথাটি লেখা নেই। লেখা আছে সেহরা (SEHRA)। বর্মণদা বললেন, স্থানীয়রা 'চেরাপুঞ্জি' বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে না। অনেক সাইনবোর্ডে 'চেরাপুঞ্জি' কেটে দিয়ে কালো কালিতে লিখে দিয়েছে 'সেহরা'। দূরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সিলেট জেলা। NGO থেকে ছোটো ছোটো গাছ লাগানোর প্রকল্প চোখে পড়ছে কোথাও।

এরপর আমরা পৌঁছালাম ৩৮০০ ফুট উঁচু নোয়াকালি কাই। জলপ্রপাতকে এখানকার স্থানীয় ভাষায় 'কহি' বলে। কাছেই 'ওয়াহা' নামে আরেকটা ছোট ফলস্ও দেখলাম। ১.৩০ নাগাদ AVRON নামে একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়াপর্ব সারলাম। আমরা রাত্রে চেরাপুঞ্জিতেই থাকবো। কিন্তু সন্ধ্যা নামার আগে আরও কতকগুলি দর্শনীয় জায়গা ঘুরে ফেলতে চাইছি। অক্টোবর মাস বলে বৃষ্টি কমে গেছে চেরাপুঞ্জিতে। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসছে আকাশে। আবার রোদও আছে। চেরাপুঞ্জির সম্মান বজায় রাখতে একবার কিছুক্ষণ হালকা বৃষ্টি হল। এরপর গেলাম ডেন্থ্লেন ফলস (Dainthlen Falls)। নামকরণের তাৎপর্য বোঝা গেল ফলস্-এর কাছাকাছি গিয়ে। প্রায় সমতলভূমির উপর বড় বড় দাঁতের মতো পাহাড়ি খাঁজের ভেতর দিয়ে সর্পিল গতিতে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ জলধারা, আর সেই জলধারা সম্মিলিত হয়ে ঝরে পড়ছে এক অতলান্ত খাদের গভীরে। মোটা লোহার রেলিং দিয়ে এই খাদ ঘিরে রাখা হয়েছে, যাতে পর্যটকরা অসাবধানে বিপদে না পড়ে। এরপর আমরা গেলাম মৌসমাই কেভ (MAWSMAI CAVE)। বাইরে অনেকগুলি বর্ণময় বাহারী দোকান, বিকেলের রোদে ঝলমল করছে। পর্যটকের ভিড়ে সরগরম। সিঁড়ি দিয়ে বেশ কিছুটা উঠে গিয়ে ১৫০ মিটার লম্বা একটা সুরঙ্গ। জল চুঁইয়ে পিচ্ছিল উঁচুনিচু গুহার ভেতরের পথ। ২০/২২ মিটার যাওয়ার পর রাস্তা এতটাই অপ্রশস্ত যে পাশাপাশি দুজন এগোনো যায় না। সেখান থেকে আমরাও ফিরলাম।

এরপর গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম সেভেন সিস্টার ফলস্। তারপর কোয়ারামা ফলস্ (Khohramha Falls)। বিকেলের পড়ন্ত রোদে দুদিকে দুটি ফলস্। চাতালের রেলিং থেকে নিচের দিকে তাকালে শিবলিঙ্গের আকৃতির বিরাট প্রস্তরখণ্ড চোখে পড়ে। নিচে জলপ্রপাত।

আমরা যে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি, সেই পাহাড়ের পরেই যতদূর চোখ চায়, বিস্তীর্ণ নিচু সমতলভূমি— ফসলের খেত— কাঁটাতারের বেড়া— আর বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ। আমরা গাড়ি নিয়ে ৫/৬ কিলোমিটার পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে নিচের অংশে গিয়ে এই জলপ্রপাতকে কাছে থেকে দেখলাম। ফেরার পথে দেখলাম, অনেক উঁচু থেকে ঝরে পড়া কেনরেম (KYNREM) জলপ্রপাত দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রাত্রে আমরা চেরাপুঞ্জির এক পাহাড়ী ঢালুপথের ধারে 'প্যাটেং হোম স্টে' তে থাকলাম। দারুচিনি গাছের কাঁটা ছাল বেটে রান্না করা সবজি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম।

পরদিন সকালবেলা সকলের ঘুম থেকে ওঠার আগেই ছোট্ট চেরাপুঞ্জি শহরের আঁকাবাঁকা পাহাড়ী ঢাল পথে একচক্কর দিয়ে এলাম। কাছেই ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। সেখানেও লেখা আছে 'সেহরা রামকৃষ্ণ মিশন'। চা টা খেয়ে আমরা রওনা হলাম জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সদর শহর 'জোয়াই' এর দিকে। প্রথমে গেলাম মউলিনং গ্রামে। এই গ্রামটি 'এশিয়ার ক্লিন ভিলেজ'-এর তকমা পেয়েছে কয়েকবছর আগে। ঢালাই করা রাস্তায় কুটোটি পড়ে নেই। প্রতিটি বাড়ির সামনে ডাস্টবিন। এখানেই প্রথম কলস পত্রিকার গাছ দেখলাম। এই গ্রামের পাশেই ২৬০ বছরের পুরোনো রিয়া রুট ব্রিজ। দুটি পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদ। তাই এ-পাহাড় থেকে সহজে ও-পাহাড় যাবার জন্য দুই পাহাড়ের দুটি বড় রবার গাছের লম্বা লম্বা শিকড়কে জোড়া লাগিয়ে আদিবাসী মানুষেরা তৈরি করেছে এই লিভিং রুট ব্রিজ। অনেক বছরের প্রচেষ্টায় তৈরি বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের প্রাকৃতিক সেতু চোখে পড়ে, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানেই আছে বাংলাদেশ ভিউ পয়েন্ট, বিএসএফ ক্যাম্প। LYNGKHAT এর কাছে আমাদের গাড়ির চাকা পাম্পচার হয়ে গেল। চাকা পাল্টাতে এখানে অপেক্ষা করতে হলো আধঘন্টা। চারদিকে সুপুরির জঙ্গল। কাছেই আরেকটি জলপ্রপাত, নাম উমক্রেন (UMKREN)।

এরপর পৌঁছে গেলাম সেই বিখ্যাত ডাউকি। যদিও পাহাড়ি নদীটার পোশাকি নাম UMNGOD, তবু লোকে বলে ডাউকি নদী। এই নদীর জলের বিশেষত্ব হল— জলের উপর থেকে তলদেশ পর্যন্ত ঝকঝকে পরিষ্কার। তাই এই নদীর জলকে বলে ক্রিস্টাল ওয়াটার (স্ফটিক জল)। লম্বা লম্বা পানসি নৌকায় অনেকেই বোটিং করছে, নৌকায় কালো ছায়া জলের তলায় নুড়িপাথরের উপর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয়, নৌকাগুলো জলে ভাসছে না, জলের উপর দিয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে।

ডাউকির ব্রিজ পেরিয়ে বড় বড় নুড়িপাথরের উপর দিয়ে নদীর গর্ভে নামলাম। একটা বড় প্রস্তরখণ্ডের ওদিকটা নাকি বাংলাদেশ, সিলেট জেলার তামাবিল অঞ্চল, এদিকটা ভারত। নদীর কাছাকাছি একটি হোটেলে আমাদের মধ্যাহ্নভোজ এই নদীরই টাটকা মাছ দিয়ে। তারপর আরেকটু এগিয়ে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী গেট। জোয়াই -এর দিকে যেতে যেতে আমলারান্টা সাবডিভিশনে আমরা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আরেকটি জলপ্রপাত দেখলাম, যার নাম KRANGSHURI (বাঙালিরা বলে করণসুরি)। সিঁড়ির অনেকগুলি ধাপ নেমে গিয়ে ভালোভাবে দেখা যায় এই উচ্ছ্বসিত ঝর্ণাধারা আর ভালোভাবে শোনা যায় এই নির্জন নির্ঝর সঙ্গীত। জয়ন্তিয়া পাহাড় প্রাকৃতিক সম্পদে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কয়লা, চুন আর সিমেন্টের জন্য চুনাপাথরের লোভে কিভাবে খুবলে নিচ্ছে প্রাকৃতিক পাহাড়ের শরীর, দেখলে কষ্ট হয়। সবুজ সুন্দর পাহাড়গুলির গায়ে আজ লোভী হিংস্র মানুষের কামড় খাওয়া দগদগে ঘা। ভালো নেই জয়ন্তিয়া। রাত্রে আমরা জোয়াই-এর 'অর্কিড ইন' হোটেলে কাটালাম।

পরদিন সকালে হোটেলের সামনে পাইনগাছের ফাঁকে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের উপর সূর্যোদয় হলো। সামনেই একটা বড় লেক। নাম— থাড়লাসকিন লেক (THADLASKEN LAKE)।

এবার আমাদের ফেরার দিন। জোয়াই থেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দরের দিকে রওনা। পথে পড়লো নাটিয়াং-এর সেই গ্রাম, যেখানে বহু বছর আগে একদা জয়ন্তিয়ার রাজা যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে বহুসংখ্যক উঁচু উঁচু অমসৃণ লম্বা পাথর খাড়াভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। কিছু চ্যাপ্টা পাথরও আছে। এই 'মনোলিথ' ইতিহাসের দুর্গম পথে আমাদের নিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। এই গ্রামেই আছে দুর্গামন্দির (যদিও মন্দিরের গায়ে লেখা আছে 'মা জয়ন্তী')। এই মন্দিরের তরুণ বয়স্ক বর্তমান পুরোহিতের ৩০ তম পূর্ব পুরুষকে জয়ন্তিয়ার রাজা মহারাষ্ট্র থেকে এনেছিলেন বলে কথিত। এককালে এখানে নাকি নরবলি হত, এখন পাঁঠাবলি হয়।

নাটিয়াং থেকে ফেরার সময় ঢালু পাহাড়ী পথের দু'পাশে পাইনের ঘন জঙ্গল বড় মায়াবিষ্ট করে ফেলেছিল। নির্জন পথের দু'পাশে মাঝে মাঝে গারো ও খাসি কিশোরীদের দোকানে বিক্রি হচ্ছে বাঁশের আচার, কামরাঙার আচার, ভূতজ্বলিকা লংকার (ভূতও জ্বলে যায়, এমন ঝাল) আচার।

মেঘালয়ের আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। সন্তানেরা ব্যবহার করে মায়ের পদবি, মায়ের সম্পত্তির ভাগ পায় মেয়েরা। ছেলেরা বিয়ের পর, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ঘরকন্না করে। মেয়েরাই রোজগারের জন্য বাইরে বের হয়। সন্ধ্যায় মেয়েরা যে যার কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলে দু'তিন ঘন্টার জন্য ছেলেরা ছুটি পায়। বাবা মাকে দেখাশোনার দায়িত্ব ছোটো মেয়ের উপর, তাই সম্পত্তির ভাগের বেশি অংশ পায় ছোট মেয়েই।

UMGET পার হতেই পাইনের জঙ্গল কমে এলো। তারপর UMDIHAR, NONGHPOH, UMLYNG পার হয়ে বর্ণিহাট, খানাপাড়া পার হয়ে আবার সেই গুয়াহাটি শহর। ডানদিকে ব্রহ্মপুত্র নদীকে রেখে বাঁদিকে পামোহি হয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তায় আমরা চলেছি। এই রাস্তার বাঁদিকে গড়ভাঙা ফরেস্ট, ডানদিকে 'দ্বীপের বিল' পাখিরালয় (৪.১ বর্গকিলোমিটার)। গড়ভাঙা জঙ্গল থেকে লেপাড ও হাতির দল এই পথেই জল খেতে যায় দ্বীপের বিলে। এইজন্য অরণ্য ও বিলের সংযোগকারী এই জায়গাটিকে বলা হয় 'এলিফ্যান্ট করিডোর'। এয়ারপোর্ট যাবার ব্যস্ত রাস্তার দুধারে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি ও অফিস গজিয়ে ওঠায় হাতিরা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। জলতেষ্টা মেটাতে তাই তারা মরিয়া হয়ে তাণ্ডব চালায় লোকালয়ে। পাখিবালয়ে কমে গেছে পাখির আনাগোনা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বর্মণদা আমাদের হাসিমুখে নামিয়ে দিয়ে গেলেন এয়ারপোর্টে।

এয়ারপোর্টে চেকিং ও বোর্ডিং পাস ইত্যাদি নিয়ম রক্ষায় দুটি ঘন্টা কাটলো। সন্ধ্যার 'ইন্ডিগো বিমান' ঘন্টাঘানেকের মধ্যে আমাদের নামিয়ে দিলো মহানগরীর কোলাহলে। চোখ ধাঁধানো আলো আর লক্ষ মানুষের কলরবে মনে হলো— স্বপ্ন দেখছিলাম, নাকি সত্যিই গেছিলাম কোথাও?

বঙ্গ সংস্কৃতির সেকাল ও একাল

ড. সুনীল কুমার দে

পরিবর্তনশীল বিশ্ব। যুগজীবনের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটছে যুগে-যুগান্তরে। সেকালের সংস্কৃতির যে রূপ ছিল একালে সেই সংস্কৃতি সেই রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে না। সেকালের সেই বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে একালে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তিত হয়ে যে রূপ বর্তমানে প্রাপ্ত হয়েছে তাতে তার আদল অনেকটাই গেছে বদলে। মানতেই হয়, পাল্টাতে পাল্টাতে বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যাপক বিবর্তন ঘটে গেছে। অবশ্য জাগতিক নিয়মে এটাই স্বাভাবিক; এই পরিবর্তনটাই প্রত্যাশিত। বাঙলার পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বঙ্গীয় সাংস্কৃতির উপর আলোচনাচক্রের যাঁরা আয়োজক, যুগোপযোগী বিষয় নির্বাচনের জন্য তাঁদের সপ্রশংস ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য।

'সংস্কৃতি' এমন একটি শব্দ, যার অর্থ সমীক্ষায় ব্যাপকতার দিক স্পষ্ট হয়ে যায়। সংস্কৃতি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ঊনবিংশ থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রভাতী প্রহরে অগণিত সুধীজন, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ আলোচকরূপে অংশগ্রহণ করে তাঁদের মহামূল্যবান আলোচনালব্ধ ফসলের দ্বারা প্রসঙ্গটিকে সমৃদ্ধ করে বিষয়টির গুরুত্বের গভীরতা ও গাঢ়ত্ব সৃষ্টি করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের সময়কাল পেরিয়ে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের যুগ প্রেক্ষাপট উত্তরণ করে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, মানসকুমার মজুমদার, বরুণকুমার চক্রবর্তী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, তাপস বসু, পিনাকেশ সরকার, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদদের নানা সৃষ্টিকর্মে, সভা-সমিতির আলোচনায় বঙ্গ সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিবর্তনের নানা প্রসঙ্গ পর্যালোচিত হয়ে বিষয়টিকে যেমন ঋদ্ধতা দিয়েছে তেমনি প্রসঙ্গটিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যন্ত উন্নীত করেছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় উত্তরণ করে দেখা যায়— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে Culture -এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গোপাল হালদার 'সংস্কৃতি' শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমস্ত কর্ম, সম্মিলিত বা সকল কৃতি প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। শব্দটির সমীক্ষায় 'সম-কৃতি' কে মাথায় রেখে তিনি লিখেছেন— 'আমরা কিন্তু সংস্কৃতি কথাটা তার ঐ ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক অর্থেই গ্রহণ করেছি— যখন বলছি, সংস্কৃতি সামাজিক মানুষের -এর রূপ— তা শিষ্ট জনের মধ্যে শুধু সীমিত নয়, ব্যাপক মানুষের সকল কৃতি নিয়ে— শিষ্ট বা সাধারণ সকল কৃতির সম্মিলিত (সম-সম্মিলিত) রূপ।' 'সংস্কৃতি' শিরোনামে পরিবেশিত প্রবন্ধে প্রখ্যাত সংস্কৃতি-প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধকার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন যে,— 'সংস্কৃতি বললে, কি বোঝা উচিত, সে সম্বন্ধে হয়তো সকলের একটা স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু একটা আবছা আবছা বোধ বা অনুমান সকলেরই আছে যে, 'সংস্কৃতি দ্বারা সাহিত্য সংগীত রূপকলা নাটক নৃত্য এই সব ধরতে হয়।' নীহাররঞ্জন রায় তাঁর যুগান্তকারী সংস্কৃতি সচেতন মননজাত সৃষ্টি 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন— 'দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অসন-বসন,

বিলাস-ব্যসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধূলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এগুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে,... জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, মীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে।'

'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ সমীক্ষায় বহুবিধ দিক উঠে আসে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণে 'সাহিত্য সংসদ' থেকে প্রকাশিত 'সংসদ বাংলা অভিধান' যা বলে তা হোল— 'সংস্কৃতি বি. ১. সংস্কার, উন্নয়ন; ২. অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার ও শিল্পসাহিত্যের মধ্যে কোনো জাতির যে পরিচয় থাকে...।' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষা সাহিত্যে বাঙালির কাছে গৃহীত। শব্দটির উপর আলোকপাতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি ভাষাচার্য বলে খ্যাত; সেই প্রখ্যাত ভাষাবিদ্‌ও শব্দটি নিয়ে তাঁর অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতো পন্ডিত ব্যক্তি ও নীহাররঞ্জন রায়ের মতো সংস্কৃতি সচেতন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের আলোচনায় শব্দটি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। বহুবিধ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এবং প্রায়োগিক তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। গোপাল হালদার শব্দটির সম্পর্কে যা লিখেছেন তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য— 'সর্বাপেক্ষা যে অর্থে সংস্কৃতি শব্দটা আমরা বাঙালীরা ব্যবহার করি তা মার্জিত ও গৌরবের হলেও তা কিন্তু ব্যাপক নয়। প্রায়ই শিল্প সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাট্যাভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি যা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৃষ্টি ও তার অনুশীলন, সে সকলকেই আমরা সংস্কৃতির বিষয় বলে বুঝি।'

সংস্কৃতির বহুবিধ দিক সমীক্ষায় এই সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়— যুগে যুগে, কালে কালে এর বিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। বঙ্গীয় সংস্কৃতির

সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার দিকটি সর্বজনজ্ঞাত। সংস্কৃতির পরিবর্তন আসলে জনজীবনেব, জাতির প্রবহমান পরিবর্তনধর্মিতারই পরিণাম। কোন জাতির সংস্কৃতির পরিবর্তন না ঘটলে সে জাতির গতিপ্রাণতা পাবে না।

ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনধর্মিতার দিকটি পুরোপুরি কার্যকর। সংস্কৃতি মানুষের যুগযুগান্তরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার স্বপ্নলব্ধ শ্রেষ্ঠ ফসল। প্রবহমানতা এর প্রধান প্রবণতা। নিয়ত রূপ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গতিশীলতার প্রাণস্পন্দনে তা স্পন্দিত। একটি দেশ, জাতির সমুন্নতির ধারক ও বাহক হোল তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতির স্বরূপ ও বহমানতা তথা গতিশীলতা সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টির আলোকে বলা যেতে পারে— 'সমগ্র জাতির চিন্তাধারা, ভাবধারা ও কর্মধারার গৌরবময় প্রতিচ্ছবিই হলো তাঁর সংস্কৃতি। মানবীয় আচার-পদ্ধতি, শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব— এই সবের সমন্বয়ের সৃষ্ট এক অপূর্ব মনোভাবই তো সংস্কৃতি। ... সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পড়ে জাতির এমন একটি মানসপ্রবণতা, এমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানময়তা, শিল্প-সাহিত্যের এমন কারুকৃতি, ধর্মের ভাবপ্রেরণা ও ঐতিহ্যের চরম সমুন্নতি, যা জাতির আনন্দময় অবচেতন মনের সামগ্রিক প্রয়াস, যা যুগযুগান্তরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। ... মানুষ তাঁর কথায় বার্তায়, চলনে-বলনে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, খেলাধুলায়, আমোদ-প্রমোদে প্রতিমুহূর্তে তার বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা রচনা করে চলেছে, রক্ষা করে চলেছে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমানতা'।

সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার দিকটি সর্বজনজ্ঞাত। সংস্কৃতির পরিবর্তন আসলে জনজীবনেব, জাতির প্রবহমান পরিবর্তনধর্মিতারই পরিণাম। কোন জাতির সংস্কৃতির পরিবর্তন না ঘটলে সে জাতির গতিপ্রাণতা পাবে না। পরন্তু বলা যায় সেই জাতি নিশ্চল পাথরে পরিণত হবে। যেহেতু সংস্কৃতির অভ্যন্তরে সমগ্র জাতির প্রাণস্পন্দন, হৃদয়লোকের স্পন্দিত ক্ষেত্র প্রাধান্য পায় সেই কারণে জাতির সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিবর্তনধর্মী প্রবণতা প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রটি অবশ্যই প্রত্যাশিত বলে মনে হয়। যে জাতির সংস্কৃতির রূপান্তর নেই, নেই বিবর্তন; সে জাতি প্রতিনিয়ত শুনতে থাকে মরণের প্রহর; শুনতে থাকে মৃত্যুর প্রতিধ্বনি। বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত পর্যালোচনায় সংস্কৃতি সচেতন জ্ঞানীগুণিজন এই সংস্কৃতির ধাপে ধাপে নানা রূপান্তর শেষে বর্তমানে তার কী রূপ প্রাপ্ত হয়েছে সে প্রসঙ্গে বহুক্ষেত্রে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মূল প্রবণতাগুলি বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বঙ্গভূমি যেহেতু ভারতেরই ক্ষুদ্র সংস্করণমাত্র সেই কারণে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। সমন্বয়ধর্মীতার দিকটি ভারত তথা বঙ্গসংস্কৃতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা। ঔদার্য্য, পরমত তথা পরধর্মসহিষ্ণুতা, সকল জাতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, পরকে একান্ত আপন করে নেওয়ার বিরাট হৃদয়বত্তায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি তার বিশেষত্বের ক্ষেত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে সাম্য, বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যেও ঐক্যসংহতি রক্ষা, সকলকে নিয়ে চলার, সকলকে নিয়ে মিলেমিশে মিলন সংগীত গেয়ে যাওয়ার একটা ঐকান্তিক আন্তরিক চেষ্টা, সমবেত দায়বদ্ধতা, সর্বোপরি এ বিষয়ে নিষ্ঠান্বিত প্রয়াস ভারত তথা বঙ্গদেশীয় সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে তুলে তার ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধ দিককে তুলে ধরেছে।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, অহিংসা, ত্যাগ, সত্য-শিব সুন্দরের আরাধনা এসব বঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা বলে বিবেচিত। সংস্কৃতি জীবনের সংগে জড়িত বলে পরিবর্তনধর্মী জীবনের ক্রমবির্তনের ন্যায় সভ্যতার বিবর্তনশীলতার ন্যায় এর মধ্যেও গতিপ্রাণতার দিকটি অবশ্য সংযোজিত। বঙ্গীয় সংস্কৃতির নিজস্ব, সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র যেমন একটি ক্ষেত্র আছে তেমনি অপরাপর নানা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে, আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি আসলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। বাঙালির ইতিহাস সম্বন্ধে অবগত হতে হলে আমাদের অবশ্যই বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগে থেকেই ধ্যানধারণা গড়ে তুলতে

হবে। বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত পর্যালোচনায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব ভাবনাসূত্রে তাঁরই লেখা 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' শিরোণামে পরিবেশিত প্রবন্ধে যেভাবে আলোকপাত করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। বঙ্গদেশের সংস্কৃতিতে তুর্কি বিজয়ের পর থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাঙালি তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও তুর্কী বিজয়ের পূর্বে একবার উত্তরভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বাঙলাদেশ সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হতে পেরেছিল। গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি সমীক্ষায় তা সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। বাঙালি জনগণের পত্তন হওয়ার পরে এই জাতি তার আদিম রূপকে গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়কালে নানা জাতি ও ধর্মের সান্নিধ্যে এসে নানা সংস্কৃতির স্পর্শ পেতে থাকে। বিভিন্ন লোকধর্ম, লোকদেবতার সংস্পর্শও ঘটতে থাকে। এইভাবে নানা ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতির সংস্পর্শ বাঙালির তথা বঙ্গের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তিত করে সেকালের অবয়বের বদল ঘটিয়ে একালে ভিন্নতর আর এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়রূপে আমাদের কাছে হাজির হতে পেরেছে।

যাত্রাপালা বঙ্গীয় গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে একটা সময় পরিবেশিত হোত। প্রথমপর্বে পৌরাণিক যাত্রাপালায় মানুষ আকৃষ্ট হলেও ক্রমে ক্রমে তাদের মূল আকর্ষণ ঐতিহাসিক পালার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক যাত্রাপালা স্বদেশিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির একটা বিশেষ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তোলে। ধর্মপ্রবণ ভক্তিপ্রাণ বাঙালির ধর্মীয় আবেদন ও ভক্তিরসধারার আবেগময়তার কথা স্মরণে রেখে বহু ধর্মীয় অধ্যাত্মভাবনা সম্বলিত ভক্তিরসের যাত্রাপালাগান ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দনকে স্পন্দিত করে রেখেছিল।

বঙ্গ সংস্কৃতির উদ্ভবেতিহাস, বিকাশ-সমুন্নতির মূলে বাঙালির প্রাণ ও মননের উদারতা, নিসর্গলোকের অকৃপণ দান-দাক্ষিণ্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী বিধৌত বাঙলার কোমল মৃত্তিকা ও পুণ্য সলিলের স্পর্শে প্রবহমানতায় বাঙালির সংস্কৃতি নূতনতর এক মাত্রা পেয়েছে। এই সংস্কৃতি যেন আপনাতে আপনি সুরভিত বিকশিত। শক, হুনদল, পাঠান, মোঘল, ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতের মানুষ এখানে এসেছে এবং বাঙালি তার বিশাল বক্ষে তাদের সমাদরের সঙ্গে বরণ করে নিয়ে তাদের সংস্কৃতির তিল তিল সোনা সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছে তার সংস্কৃতির অনবদ্য মনোরম তিলোত্তমা মূর্তি। বাঙালি হয়েও যিনি বিশ্ববরেণ্য, সেই রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ভারততীর্থের ভাবনায় মহামানবের এই সাগরতীরে দাঁড়িয়ে বাঙালির উদার হৃদয়ের ভাষ্য—

> "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
> শক হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
> এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলান—
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
> এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।
> মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
> সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে—
> আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"

ভারতীয় সংস্কৃতির নাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে বঙ্গসংস্কৃতি। একথা মেনে নিয়েও বলতে হয় জননী-জঠরজাত বঙ্গ সংস্কৃতির অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রও যথেষ্ট সমুজ্জ্বল। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে আছে নানা ধর্ম, তাদের আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা, উক্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের দেবদেবী এবং সেইসব দেবদেবী কেন্দ্রিক জনজীবনের নানাবিধ সৃষ্টিকলা। পৌরাণিক দেবদেবী এবং লৌকিক দেবদেবী মিলে মিশে একাকার হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির এক অভিনব অধ্যায় উপহার দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে নানা ধারার মঙ্গলকাব্য (মনসা, চন্ডী, ধর্ম, শিব, শীতলা প্রভৃতি), নানা লোকসাহিত্য বঙ্গ সংস্কৃতির বৃক্ষকে এতখানি পুষ্টতা দিয়েছে, যা অভাবনীয়প্রায় বলে বিবেচিত। গ্রামাঞ্চলে নানা কথাকাহিনী প্রচলিত। সেইসব লোককথার কথাকাহিনীতে গ্রামীণ সংস্কৃতির তৎকালীন রূপ সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। কৃষ্ণকথা, রামায়ণ কথা, পুরাণের নানা কথাকাহিনী একটা সময় গ্রাম্য চণ্ডীমন্ডপীয় আসরে, দেবস্থানে পরিবেশিত হোত। আলস্য, নৈষ্কর্ম্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে সান্ধ্য আসরে বঙ্গ সংস্কৃতির এই বিশেষ একটি দিক তৎকালে প্রত্যক্ষ করা গেলেও অধুনা সেগুলি লুপ্ত। রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যাদের নিয়ে ঠাকুমাদের গল্প বলার সেই সেদিনের সংস্কৃতি ইন্টারনেটের যুগে একেবারেই হারিয়ে গেছে। গ্রামের আসরে কিংবা যৌথ পরিবারে প্রবীণতম ব্যক্তির কাছ থেকে এখন আর রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শোনা যায় না। রূপকথার পাত্রপাত্রীরা আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

যাত্রাপালা বঙ্গীয় গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে একটা সময় পরিবেশিত হোত। প্রথমপর্বে পৌরাণিক যাত্রাপালায় মানুষ আকৃষ্ট হলেও ক্রমে ক্রমে তাদের মূল আকর্ষণ ঐতিহাসিক পালার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক যাত্রাপালা স্বদেশিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির একটা বিশেষ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তোলে। ধর্মপ্রবণ ভক্তিপ্রাণ বাঙালির ধর্মীয় আবেদন ও ভক্তিরসধারার আবেগময়তার কথা স্মরণে রেখে বহু ধর্মীয় অধ্যাত্মভাবনা সম্বলিত ভক্তিরসের যাত্রাপালাগান ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দনকে স্পন্দিত করে রেখেছিল। সমাজবাস্তবতা, সামাজিক সমস্যা, সমাজের অবক্ষয় থেকে শুরু করে নানা প্রথা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, শোষণ, প্রতিবাদ, প্রতিকার, জনগণের নানা দাবি-দাওয়া সম্বলিত সংগ্রামী মননের প্রকাশ— এসবও যাত্রাপালাতে এসে হাজির হয়। এককথায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পেরিয়ে পরিবর্তিত যুগজীবন ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যাত্রাপালার সামাজিক ধারাটি বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে এসে হাজির হোল।

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যাত্রাপালার পাশাপাশি পুতুলনাচের প্রচলন ছিল।

প্রায় ক্ষেত্রে এক একটি এলাকায় মাসাধিককাল ধরে পুতুলনাচ হোত। মূলত সেখানে এমনসব কাহিনি নির্বাচন করা হোত যেগুলি বঙ্গজনগণের অন্তর্লোকে নাড়া দেওয়ার মতো। পুতুলগুলিকে এমনভাবে হাজির করা হোত যা দর্শকদের কাছে সজীব প্রাণবন্ত সত্ত্বাধিকারী বলে বিবেচিত হোত। পরিবেশক যদিও একক প্রয়াসে মূলতঃ বিষয়টিকে হাজির করতো তবুও তার সহায়ক হিসাবে বেশ কয়েকজনের প্রয়োজন হোত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা পালাগানের মাধ্যমে বিনোদন ও লোকশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে এই পুতুলনাচের আসরগুলি এককালে জমজমাট রূপ নিয়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই ধারাটিকে প্রাঞ্জল করে তুলেছিল। যাত্রা থিয়েটার, পুতুলনাচ প্রভৃতির মাধ্যমে বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষধারা এককালে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এখন আর সেই রূপ তেমনভাবে চোখে পড়ে না। জমিদার বা অভিজাত ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতায় যে যাত্রাপালা, থিয়েটার প্রভৃতির প্রচলন হয়েছিল তা বর্তমানে অবলুপ্ত প্রায়। পুতুলনাচের প্রসঙ্গটিও অবলুপ্তির অধ্যায় রচনা করে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে। ধূলিয়ান ও নির্মিতার জমিদারবাড়ির ইতিবৃত্ত সমীক্ষায় যাত্রা থিয়েটার-নাটক ও নানা সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র কতখানি গভীর তা অবগত হওয়া যায়। বিশেষ করে নির্মিতার চৌধুরী পরিবারের কথা তো সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াসে বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে পৌঁছে গেছে। পুরানো দিনের নামীদামী যাত্রাশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক, কবি-লেখকদের মাধ্যমে এই জমিদারবাড়িতে চাঁদের হাট বসেছে এককালে। আজ আর সেই দিন নেই। বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে নির্মিতার জমিদারবাড়ি মৃত্যুর প্রহর গুণছে। সুতি-সামসেরগঞ্জের সংস্কৃতিতে যে ঐতিহ্য এককালে এলাকাটিতে ঋদ্ধ করেছিল পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তা হারানো পুরোনো স্মৃতিছাড়া আর কিছু নয়। মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হিন্দু থিয়েটার মঞ্চ আজ আর নেই। গঙ্গা গ্রাস করেছে তাকে। রীতেশমঞ্চ এখনও দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু যাত্রা-থিয়েটার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সেই নাড়ীর যোগসূত্র আর খুঁজে পাওয়া না। এই এলাকায় হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার ভাবনায় এখনও অনেকে সচেষ্ট।

বঙ্গ সংস্কৃতির কত না বিচিত্র ধারা। সাহিত্য সংগীত সংস্কৃতিতেই আছে কত না বিচিত্র রূপ। পাঁচালি, কবিগান, বাউল-ভাটিয়ালি, জারি-সারি-মুর্শিদা, কীর্তন, আলকাপ, গম্ভীরা, ভাদু, তুষু প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির বিচিত্র বৈভবের কথা অবগত হওয়া যায়। এসবের রাজসিক সমৃদ্ধির দিক এককালে বাঙলার গ্রামগঞ্জকে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চূড়ান্ত ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণচূড় অধ্যায়। গ্রামীণ মেলা উৎসবে, কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও পারিবারিক ক্রিয়া-কলাপও আনুষ্ঠানিকতায় এসবের সংযুক্তি ছিল। হাস্যকলতানে, রসের প্লাবনে, আনন্দ উচ্ছ্বাস ফেনিলতায় সেদিনের সেই সংস্কৃতির ধারা দিনে দিনে ক্ষীণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত ক্ষীণকায়রূপকেও হারিয়ে ফেলে অবলুপ্তির ঘোরতম অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। এসব পালাকীর্তন, সংগীতসাধন ও সাহিত্যধর্মী ক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গীয় সংস্কৃতি তার যুগযুগান্তরের কতনা বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পাতায় অম্লান জ্যোতিতে অক্ষয়, চিরভাস্বর রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কৃষিতে, বাণিজ্যে, কারুশিল্পে সর্বক্ষেত্রে এই বাঙালি তার সংস্কৃতির পালাবদল ঘটিয়ে চলেছে। পুরানো দিনের মন্দিরে, মসজিদে আমরা বঙ্গ সংস্কৃতির যে নিপুন নিঁখুত ঋদ্ধ শৈল্পিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ্য করি বর্তমানে তা আর সৃষ্টি হয় না, স্বাভাবিকভাবে সেগুলির দিকে শিল্পরসিক, সংস্কৃতি-সচেতন সুধীসমাজ বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বাঙালির নির্মাণকর্মে, মেয়েদের আলাপনা-নক্সায়, কাঁথার নানা কাজে, বস্ত্রশিল্পের নানা নিদর্শনে, বিশেষকরে বালুচরি শাড়ির কাজগুলিতে অতীত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। নক্সীকাঁথায় বঙ্গীয় সংস্কৃতির ঋদ্ধদিকের দেখা মেলে। শীতলপাটি, চাটাই, তালাই, মাদুর, মোড়া, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কাঠশিল্পী বা দারুশিল্পী, পটশিল্পী প্রভৃতিদের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে বঙ্গ সংস্কৃতির অনন্যতার ছাপ মেলে। নানা বাদ্যযন্ত্রের সুরেলা তানে, সুমিষ্ট কলতানে বঙ্গসংস্কৃতির আর এক ধারার স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র স্বীকৃত। সংস্কৃতির এই সব স্বর্ণোজ্জ্বল ক্ষেত্রগুলি একদিন সংস্কৃতি-অনুরাগী বাঙালিকে বিমুগ্ধচিত্ত করে রাখলেও যুগজীবন, রুচি প্রভৃতির পরিবর্তনে এসব সমৃদ্ধ ক্ষেত্রগুলি ক্ষীণকায়া তটিনীর রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। সেদিনের সংস্কৃতির সেই স্ফীতকায় তটিনী আজ বালুশয্যাশায়ী হয়ে স্রোতহারা রূপ প্রাপ্ত হয়েছে যেন।

এসব পালাকীর্তন, সংগীতসাধন ও সাহিত্যধর্মী ক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গীয় সংস্কৃতি তার যুগযুগান্তরের কতনা বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পাতায় অম্লান জ্যোতিতে অক্ষয়, চিরভাস্বর রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কৃষিতে, বাণিজ্যে, কারুশিল্পে সর্বক্ষেত্রে এই বাঙালি তার সংস্কৃতির পালাবদল ঘটিয়ে চলেছে।

মহামানবের মিলনতীর্থ আমাদের এই বঙ্গভূমি। বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশোন্মুখ দিকটি সৃষ্টি হয়। সূফী সাধনার সংযোগে এই সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিমের যোগসূত্রেই নিবিড় নৈকট্য সংস্থাপিত হয়। ইংরেজের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পর্যবসিত হলেও, তাদের মাধ্যমে কিছু রূঢ়তা, নৃশংসতা প্রকাশিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের মাধ্যমে প্রগতিধর্মী সভ্যতা সংস্কৃতির বহমানতা যে সৃষ্টি হয়েছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজরা আমাদের প্রায় সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেলেও শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতিতে কিছু যে দিয়ে গেছে তা মানতেই হয়। প্রাচীন বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানাভাবে ভাঙনের নির্মম আঘাত দেখা গেছে পরবর্তী সময়কালে। গ্রামীণ অকৃত্রিম সংস্কৃতির ধারা নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অভিঘাতে শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। গ্রামজ খাঁটি সংস্কৃতির ধারা নগরকেন্দ্রিক কৃত্রিমতায় ভরা ঝা-চক্‌চকে রূপ পেলেও দিনে দিনে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের, সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে কৃশতা, দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে তা মানতেই হয়; তা বুঝতে কোনোরূপ অসুবিধা হয় না সংস্কৃতি অনুরাগী, সংস্কৃতি সচেতন সুধী সমাজের। এখন আর গ্রামে গ্রামে রামায়ণ কথা তেমনভাবে আসর জাঁকিয়ে বসে না, বাউলের মেলাও তেমন সর্বত্রপ্রসারী হয়ে দৃষ্টি কাড়ে না। বিষয়টির উপর আলোকপাতে পরিবর্তিত যুগপ্রেক্ষাপটে বঙ্গ সংস্কৃতির সংকটের চালচিত্রায়নে সমালোচকের কথা দিয়ে বলি— 'এখন আর গ্রাম্য আসরে, পাড়ায়-পাড়ায় লোকসাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা

তেমনভাবে চলে না। হারিয়ে যেতে বসেছে বাউল-ভাটিয়ালি। আলকাপ, গম্ভীরার দেখা মেলে কালে ভদ্রে। ছৌনৃত্য, তুষু, ভাদু গান তো পরিসরের প্রসরতা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে সীমিত পরিসরে সীমিত সংখ্যক মানুষের কাছে আদরে-অনাদরে কোনক্রমে টিকে রয়েছে। আধুনিক চটুলগানে আমাদের সংস্কৃতির সাংগীতিক ঐতিহ্য অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। বঙ্গ সংস্কৃতি এখন অনেকটাই সংকটের মুখোমুখি।

সংকট প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন কিছু জাগেই। কী সেই প্রশ্ন। প্রশ্নটা হোল কী কী কারণে বঙ্গসংস্কৃতি তার স্বর্ণযুগীয় পরিমন্ডল থেকে বিচ্যুত হোল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে উল্লেখ করতে হয়। একটা সময় ছিল যখন মানুষ রাজনীতিটাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতো। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাজনীতিটা অর্থ উপার্জনের পেশামাত্র। মানবকল্যাণ নয়, মানুষের ক্ষতি করার, মানুষকে জব্দ করার কৌশল হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির কুশীলবেরা যুক্ত হওয়ায় তাদের মাধ্যমে সংস্কৃতির গঠনমূলক দিক গড়ে ওঠেনি। সভা-সমিতিতে বিকট আওয়াজে শব্দ দানব কাল ঝালাপালা করে, রাজনীতির দাদাদের দাদাগিরিতে সাধারণ মানুষ যেখানে নাজেহাল, আতঙ্কে আতঙ্কে দিন কাটায় সেখানে সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, ভীতিপ্রদর্শন, শক্তির দম্ভ প্রকাশ, হার্মাদদের নৃশংশতা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা— এসবের মাঝে বঙ্গ সংস্কৃতির সেই সুবর্ণযুগকে কেমন করে পাওয়া যাবে? অপসংস্কৃতির বাড়-বাড়ন্ত রূপ দেশ, জাতি, সমাজ, সংসারকে ক্লেদ-কালিমার পঙ্কিল আবর্তে চির-মজ্জমান করে তুলতেই যেন সদাব্যস্ত। আজ ওপারে তাই কেঁদে চলেছে মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখার দল, এপারে কেঁদে চলেছে ফুল্লরা-লহনা-বেহুলারা। ওপারের ভাটিয়ালি আর আকাশ-বাতাস মুখরিত করে দিগন্তবিস্তারী সুরের লহরী তোলে না; এপারের বাউল গলা ছেড়ে গান গাওয়া বন্ধ করে অন্য পেশায় প্রবেশ করে মরণযন্ত্রণায় ছটফট করে। উৎকট যান্ত্রিকতা, তথ্যপ্রযুক্তির অতি উন্নয়ন, টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেটের যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির সেকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর চোখে পড়ে না। বর্তমানে উৎকট আধুনিকতার বিষবাষ্পে বাঙলার সমাজ, সংসার, পরিবার, পরিবারের তরুণ-তরুণীরা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত; ঘরে-বাইরের নানা আঘাতে বঙ্গ সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে আজ যে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে হাজির হচ্ছে তা কতখানি সর্বনাশা রূপ প্রাপ্ত হয়ে কোথায় যে শেষ-থামা থামবে তা বলা দুষ্কর।

বঙ্গ সংস্কৃতির সুতিকাগার থেকে, ক্রমবিকাশপর্ব পেরিয়ে চূড়ান্ত সমুন্নতিরকাল পর্যন্ত পরিক্রমায় এর রাজসিক ঐশ্বর্য্যের, সমৃদ্ধির ক্ষেত্র যেমন প্রত্যক্ষ করা গেছে তেমনি আবার কালের অমোঘ নিয়মে এর চরম সংকটময়তার দৃশ্যও দেখা গেছে। কৃষি, বাণিজ্য, কুটির শিল্পে বাঙালির ঐতিহ্য, বাঙালির কর্মপ্রয়াস, তার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় উপহার দিলেও বর্তমানে বিপন্নতার ক্ষেত্রটিও আমাদের বড্ড বেশি করে ভাবাচ্ছে। এই বিপন্নতা, এই সংকট প্রেক্ষাপটে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলে ওঠেন— বঙ্গভাষীদের দিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, বলিতে হয়, আজ বাঙালি জনগণ বড়োই বিপন্ন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিকেই সে বিষম সংকটে পড়িয়াছি। ... বাঙালীর বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুর— সমাজের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত ক্রমাগত আসিতেছে, তাহাতে তাহার সংস্কৃতির কথা দূরে থাক, সে নিজে টিকিবে কিনা এবং টিকিলে কিভাবে টিকিবে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিতেছে।' বাঙালির মধ্যবিত্ত কৃষক, শ্রমজীবী নানা পেশার মানুষজন, নানা ধারার শিল্পী-সম্প্রদায় যেভাবে বিধ্বস্ত হতে শুরু করেছে তাতে বঙ্গ সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটাটাই স্বাভাবিক বলে বহু বিদগ্ধ সংস্কৃতি-সচেতন, সংস্কৃতি-অনুরাগী সুধীজন মনে করেন।

বাঙালির মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ধর্মীয় নানা ধারার সংস্কৃতিতে সমুন্নত ক্ষেত্র একটা সময় যে প্রস্তুত ছিল তা সমালোচকের কথাসূত্র ধরে স্মরণ করা যেতে পারে। 'বাঙালির মানসিক আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বলিত শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি টোল-চতুষ্পাঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে নানা আধ্যাত্মমূলক সৃষ্টিধারায় বিকশিত ব্রাহ্মধর্মের প্রেক্ষাপটে রামমোহন, দ্বারকানাথ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বহুবিধ বলিষ্ঠ ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। আধুনিক বাঙলার শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাট্যচর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণার আলোকেও বাংলা সংস্কৃতির সমুন্নত ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে দেখা যায়।'

উৎসবমুখর বাঙালাতে বারো মাসের তেরো পার্বণ লেগেই আছে। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। আমাদের সামাজিক, ধর্মীয়, পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। মুখে ভাত (অন্নপ্রাশন), পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে ব্রতকথা, পূজা-অর্চনা প্রভৃতির মাধ্যমে বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সাক্ষ্য মেলে।

বাঙালির মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ধর্মীয় নানা ধারার সংস্কৃতিতে সমুন্নত ক্ষেত্র একটা সময় যে প্রস্তুত ছিল তা সমালোচকের কথাসূত্র ধরে স্মরণ করা যেতে পারে। 'বাঙালির মানসিক আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বলিত শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি টোল-চতুষ্পাঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে নানা আধ্যাত্মমূলক সৃষ্টিধারায় বিকশিত ব্রাহ্মধর্মের প্রেক্ষাপটে রামমোহন, দ্বারকানাথ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বহুবিধ বলিষ্ঠ ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। আধুনিক বাঙলার শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাট্যচর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণার আলোকেও বাংলা সংস্কৃতির সমুন্নত ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে দেখা যায়।' উৎসব ঐতিহ্য সেই সেদিনের সংস্কৃতির গঠনমূলক ঋদ্ধ দিক বর্তমানে তেমনভাবে চোখে পড়ে না উৎসব-অনুষ্ঠানের আন্তরিকতা, অকৃত্রিমতা এখন আর কোথায়? এখন মেলা বা উৎসব মানেই বেলেল্লাপনা, উৎসব মানেই উদম নৃত্য, উৎসব মানেই সুযোগসন্ধানিদের অর্থ তছরূপের, নোংরামির, চূড়ান্ত বাড়-বাড়ন্ত দিক। উৎসব মানেই দাদাগিরি, অপসংস্কৃতির ছড়াছড়ি। এ সংস্কৃতি আমরা চাই নি, সংস্কৃতির এই বিকৃতিতে আমরা লজ্জিত, কুণ্ঠিত। অবশ্য এ চিত্র কিছুটা সময়কাল

পিছিয়ে গেলে দেখা যেত না। স্মরণের চলাচল সহজ-সরল করে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশই বছর পিছিয়ে গেলে সংস্কৃতির একটি অকৃত্রিম ধারার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যেত। আজ মনে হয় সেই দিনগুলি কতনা ভালো ছিল। বাউরি-বাগদিপাড়ায় সবে শীতের ছোঁয়া লাগা সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা বসে যেতো তুষুগান গাইতে। কখনো কখনো সেই ঘরোয়া আসরে স্কুল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও গেয়ে উঠতো— 'তুষু আমার মাগো/জামাই আনতে যা গো/জামাই আনা অমনি নয় মা/একশ টাকা খরচ গো...।' মকর সংক্রান্তির দিনে তুষু গানে প্রহরে প্রহরে রাত্রিকে মুখরিত করে উষালগ্নে নদীতে, খাল-বিলে, বড় বড় পুকুর দিঘিতে স্নান করে একমাসব্যাপী এই ব্রতকথার সমাপ্তি ঘোষিত হোত। অন্ত্যজ গোষ্ঠীর (মূলত বাউড়ি-বাগদি) মেয়েদের এই ব্রত উদযাপন শেষে দলবেঁধে শীতের ভোরে গান গাইতে গাইতে গিয়ে তুষুকে বিদায় দেওয়ার দৃশ্যে একটা কারুণ্যের সুর ও বিষাদের সুরও যেন ছড়িয়ে পড়তো। এখন এসব আর চোখে পড়ে না। এখন পাল্টে গেছে সময়, পাল্টে গেছে মানুষের রুচিবোধ। এখন সেইসব ব্রতকথা, নানা ঋতুকেন্দ্রিক নানা পাল-পার্বণ যেন বিরল দৃশ্য। তরুণ প্রজন্ম, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এখন তাদের ব্যস্ত জীবনে সেদিনের ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতির অতীত শিকড়ের টানে আকর্ষণ অনুভব করে না।

সময়ের স্রোত নিয়ত বহমান। থামাথামির সময় নেই তার। দিন পাল্টেছে, পাল্টেছে মানুষের রুজিরোজগার ও জীবন ধারণের কলাকৌশল। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা— এসব এখন অভিধানে আবদ্ধ শব্দমাত্র। সেদিনের ক্ষেত ভরা ফসল, গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, মাছে ভরা পুকুর অর্থাৎ সেই স্বচ্ছল অবস্থা এখন আর সবার ক্ষেত্রে নেই। এখন দুধেভাতে বাঙালির দিন গুজরান করাটাই কষ্টকর। এর উপর আছে তাদের বিনোদন সর্বস্ব ভাবনা। মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তও আজ সস্তার নানা বিনোদনে মাতোয়ারা। শ্রমজীবী পরিবার, নিম্নবিত্ত কৃষক অতীতের বারো মাসে তেরো পার্বণকে আর তেমন হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে অপারগ। দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় তাদের দিন কাটে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, মাটির উর্বরতা হ্রাস, ফড়েদের উপদ্রব, উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে এই সব স্বল্প আয়ের জনগণ উৎসবমুখর পরিমন্ডল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে সন্ধানি দৃষ্টি ফেলে গবেষণাসুলভ মননপ্রবণতার সাক্ষ্য রেখে মলয় রায় লিখেছেন— 'বাংলার কৃষককুল আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মাটির উর্বরাশক্তি কমছে। ফলন কম হচ্ছে। উৎপাদন খরচ বাড়ছে। তুষু উৎসবের মূল সহযাত্রীদের অধিকাংশইটাই কৃষক এবং শ্রমজীবী জনগণ। ... শুধু তুষু কেন। ভাদু, ঝুমুর, বাউল, বাংলার নবান্ন উৎসব সবেতেই মন্দাভাব। ... লোক সংস্কৃতির মূল উৎস চাষাবাস। এই কৃষিজীবনই কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক-বাহক। ... লজ্জার কথা, ... একবিংশের নতুন প্রজন্ম গাইছে— বেলুন বেলুন দাদা... লজ্জা হয়। বাংলার নবান্ন উৎসব ভোঁ ভোঁ করছে। ভাদু শোনা যায় না। লেটো যাত্রা টিমটিম করছে। রামযাত্রা, কেষ্টযাত্রা, কৃষ্ণকীর্তন ওই কোনোরকম করে চলছে। লোক সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নে রয়েল ওয়ার্ল্ড টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে চটুল জীবন বিরোধী গান।'

পরিবর্তন প্রেক্ষাপট বঙ্গীয় সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় আমাদের বহুসাধনার, স্বপ্নের সেই সংস্কৃতি তার অতীত গৌরব হারিয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, মানসিক, কৃষি, ব্যবসা, ক্রীড়া, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, শিক্ষা প্রভৃতি সব ধারার সংস্কৃতিতেই সেকাল আর একালের রূপের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সংস্কৃতি দেশ ও জাতির সমুন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট স্মারক। দীর্ঘদিনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরে পরিবর্তিত রাজ্যসরকার আশার আলো দেখানোর পথে অগ্রসর হয়েছে অনেকখানি। উৎসব অনুষ্ঠানে, মেলায় রবীন্দ্রসংগীতকে আবার মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন প্রয়াসের মাধ্যমে বাঙলার জনগণ আবার তাদের সমুন্নত সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। সার্বিক উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বঙ্গসংস্কৃতি আবার হারানো গৌরব ফিরে পাবে বলেই আশায় বাঙালি আবার বুক বাঁধতে শুরু করেছে।

ঋণ স্বীকার :

ব্যক্তিগত : ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. পিনাকেশ সরকার, ড. তপন কুমার কর্মকার, শ্রীমন্ত দাস, মোপাসা দাস।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধগত : সংসদ বাংলা অভিধান, আসা-যাওয়ার মাঝখানে, লোক সংস্কৃতির তত্ত্ব ও স্বরূপ সন্ধান, বাঙালীর সংস্কৃতি, বাজিতপুর ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা, সংস্কৃতির দর্পণে সুতি-সামসেরগঞ্জ, অরঙ্গাবাদের শিক্ষাপ্রসার প্রসঙ্গ, লেখকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক নানা প্রবন্ধ, 'সংবাদ' পত্রিকা।

ঠিক ভুল

বিপাশা গোস্বামী (প্রাক্তণ ছাত্রী)

চারতলা অবধি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে গেল উজানীর। শ্বাসকষ্টটা বেশ চাগাড় দিয়েছে। ইন্‌হেলরটা একবার নিলে বোধহয় ভাল হত। পরমাদের ফ্ল্যাটের সামনে ও ট্রলিটা রাখে। দরজাটা খোলাই রয়েছে। রজনীগন্ধা আর ধূপকাঠির এক অদ্ভুত গন্ধ, যেন কতই না বিষণ্ণতা নিয়ে গন্ধটা পরমাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে গোটা কমপ্লেক্সে। এক মিনিট থমকে দাঁড়ায়ও। তারপর ধীরে ধীরে ঢোকে। ড্রয়িংরুমটা একইরকম রেখেছে পরমা। অগোছালো, আলুথালু। মেঝেতে আসনে বসে। পুরোহিতমশাই মন্ত্রোচ্চারণ করছেন আর পরমা ওনাকে অনুসরণ করছে। বড় বড় কাঁসার থালায় চাল, পাঁচফল, সবজি, মিষ্টি, চন্দন পাটা, ফুল, কোশাকুশি, ধূপদানীতে ধূপ আর টুলে গুজরাতি কাজ করা টেবল ক্লথের উপর এনলার্জ করা রাজর্ষির ছবি। আর তাতে মোটা এক গাছি, রজনীগন্ধার মালা।

উজানীর দিকে চোখ পড়তেই পরমা ওকে হাতের ইশারায় বসতে বলে। উজানীও ওকে অযথা ব্যস্ত হতে বারণ করে। একে একে ভিড়টা হালকা হচ্ছে, এই হাউজিংয়ের লোকজন বরাবরই খুব ভাল ছিল। পুরোহিতমশাই যাবার আগে পরমার মাথায় হাত রেখে বলেন, 'মন খারাপ করো না মা, গীতায় লেখা আছে, আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না।' পরমা জানে এগুলো কথার কথা। দাদার কথা কানে আসতেই চোখে জল আসে ওর। একটু ম্লান হাসার চেষ্টা করে ও।

'উজানী, সেই কখন থেকে বসে আছিস, যা ফ্রেশ হয়ে নে। কতখানি ট্রেন জার্নি করে এসেছিস।' দাদার মৃত্যুতে পরমা হয়তো ভীষণ ধীর, স্থীর বা গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর কথাগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা শোনাল। ঘরে গিয়ে ট্রলি খুলে তোয়ালে, শ্যাম্পু, সাবান, হাউজকোট বের করে। হ্যান্ডব্যাগ খুলে ইনহেলরটা বের করে দুপাক নেয় ও। তারপর বাথরুমে ঢোকে। বেসিনে গিয়ে ভালকরে চোখে মুখে জল দেয় ও। মানুষের মনে যত-ই রাগ, অভিমান বা দুঃখ জমা থাকুক, না কেন একটা সময় পর ফিকে হয়ে আসে সব-ই।

যেমন একদিন উজানী বিনা নোটিশে ওর মা-বাবা আর পরমাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে ওর পক্ষে রাজর্ষিকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন? রাজর্ষি হ্যান্ডসাম, রিসার্চ স্কলার, ব্রাইট ফিউচার। রাজর্ষির মা ভীষণই ভাল। আর পরমা তো ওর বেস্ট ফ্রেন্ড। তাহলে কেন ও রাজর্ষির সাথে এত মাখামাখি করল। বিয়ে যখন করবেই না। মা তো ওকে মারতে বাকি রেখেছিল। কিন্তু ওর এক গোঁ। রাজর্ষিকে বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কি ভাবেই বা সত্যটা ও সবাইকে বলত! সে যে ভীষণ লজ্জার, অপমানের। রাজর্ষিকে বিয়ে করুক বা না করুক রাজর্ষির দোহারা চেহারা, চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে কথা বলা, কথা বলার সময় হাত নাড়ান, ঘাড়টা একটু হেলিয়ে হাঁটা, আর সারা দিনে বার বার চা খাওয়া। এসবের মধ্য দিয়ে রাজর্ষিকে যে ও দিনে কতবার মনে করে! রাজর্ষির মৃত্যুটা-ই হয়তো উজানী পরমাকে আবার এক করে দিল।

কিন্তু কেন ও কোলকাতায় এল? রাজর্ষি বেঁচে থাকতেই আসেনি। অবশ্য ও জানতও না যে রাজর্ষির ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে। আচ্ছা, জানলে কি ও আসত? না, না, আসত। লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দেখে চলে যেত। স্নান শেষ। তোয়ালে চুলে পেঁচিয়ে, হাউসকোটটা পড়ে ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়ে।

'ওহ্! তোর এতক্ষণ লাগল?

পরমার গলায় স্পষ্টই বিরক্তি।

'নে, চা খা।' চা খেলে শরীর ভাল থাকে।

শোন উজানী, চা খেয়ে তুই রেষ্ট নে।'

শ্রাদ্ধবাড়ি তো অনেক কাজ পেন্ডিং আছে রে। সেগুলো সারি। তুই দাদাভাইয়ের ঘরে যা, শোকেশের উপর হেয়ার-ড্রয়ারটা ওরকম-ই আছে। চুলটা শুকিয়ে নিস। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। উঠে যেতে যেতে পরমা বলে। কী মনে পড়ায় আবার ফেরত আসে পরমা। উজানীর দিকে এগিয়ে দেয় সাদা একটা খাম। বলে—

'দাদার তো সব চিঠিই তুই ছিঁড়ে ফেলেছিস উজানী। আজ তো দাদা বেঁচে নেই, পারলে চিঠিটা পড়িস।'

তোদের অকারণ জেদ আর ভুল বোঝাবুঝি। জানিস উজানী, 'কতরাত দাদা এই এক টুকরো ব্যালকনিতে ইজি চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিয়েছে।'

'ভুল, উজানী! বড় ভুল করে ফেলেছিস তুই।' পরমার গলাটা হঠাৎ-ই খাদে নামে।

'না আমি ভুল করিনি। জাস্ট করিনি।' এসব কথা থাক। উজানীও আর না বলে পারে না।

'তুই ভুল করেছিস আর এখনও করছিস'।

দাদাভাই মারা যাওয়ার আগে আমায় সবাই বলেছে রে। শোন উজানী, একজন মানুষ যে জানে তার পরমায়ু কটা দিন মাত্র, তার কোন দায় থাকে নারে কারো মন রেখে কথা বলার। তার কারো উপর টান থাকে না, মায়া থাকে না, রাগ-বিদ্বেষ কিছুই থাকে না রে। যে দাদা এত চা আর সিগারেট খেত সে ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে জানার পর ওসব বন্ধ করে দিল জানিস। কিছু জিজ্ঞেস করলে ঠোঁটের কোণে জোর করে একটু হাসি এনে বলত, 'ইচ্ছে হয় না রে বোন।'

'চিঠিটা পড়িস উজানী,' পরমা চলে যায়।

সন্ধ্যেবেলায় অনেকক্ষণ ঘুমানোর দরুণ টায়ার্ড ভাবটা পুরোপুরি কেটে যায় উজানীর। উঠে গিয়ে কফি বানিয়ে সবাইকে দেয়ও। নিজেও নেয়। বেশ খানিকটা চিড়ে ভাজাও খায়। পরমাকে ও দেখতে পায় না। রুশাকে দেখতে পায়। পরমার একরত্তি মেয়ে। ওকে ডেকে চটকাতে চটকাতে বলে, 'শোন বাবু, আজ রাতে কিছু খাব না। মাকে একটু বলে দিবি?'

'হ্যাঁ'— ঘাড় হেলায় রুশা।

— তোর কোন সাবজেক্ট পড়তে ভাল লাগে রে রুশা?'

—'ইংরেজি গো।'

টুকটাক কথা বলে উজানী আবার রাজর্ষির ঘরে চলে আসে।

রাজর্ষির ঘরে ঢুকে দরজাটা ও বন্ধ করে দেয়। জোরে জোরে শ্বাস নেয় উজানী। যদি রাজর্ষির গন্ধ পাওয়া যায়। ঘাম, সিগারেট, আর পারফিউমের এক বন্য গন্ধ ওকে ঘিরে থাকত। 'নাহ্! পেলনা।' রাজর্ষির ইজিচেয়ারের হাতলটা ধরে দাঁড়ায় ও। ফিরে যায় অতীতে।

মফস্বল থেকে কলকাতায় কলেজে পড়তে গিয়ে উজানীর পরমার সাথে আলাপ। পরমা ভীষণ ভাল ছিল পড়াশোনায়। আর ও মাঝারি মানের। তবু বন্ধুত্বটা হয়েছিল। পরমার কথার বেশিরভাগটাই জুড়ে থাকত ওর বেস্ট ফ্রেন্ড, ওর দাদাভাই রাজর্ষি। ওর দাদাভাই বস্টনে মাইক্রোবায়লজিতে ডক্টরেট করছে। কয়েক বছর ধরে ওখানেই আছে, তবে এবার দেশে ফিরবে। পরমার মুখে ওর দাদার কথা শুনে শুনে রাজর্ষির একটা ছবি এঁকে ফেলে উজানী মনে মনে। হয়তো খানিকটা 'প্লেটোনিক লাভ'ও তৈরি হয় ওর মধ্যে।

এবার চেয়ারটার উপর বসে পড়ে উজানী। বোনকে আর প্রাইজ দিতে রাজর্ষি হাজির বোনের কলেজে। ইন্ডিয়ায় ফেরার দিনটা অবধি রাজর্ষি কাউকে বলেনি। বোনের চোখে চমক দেখতে চেয়েছিল সে, আর পড়বি তো পড় উজানীর সামনে। উজানীকেই জিজ্ঞেস করে,— 'ইকনমিক্সের পরমা মিত্রকে একটু ডেকে দেবে?' বল ওর দাদা এসেছে। রাজর্ষি বলে।

'পরমার দাদা মানে রাজর্ষি। ওর কথাই তো এতমাস মনে মনে ভেবে এসেছে।' যাচ্ছি দাদা। উজানী বলে।

'দাঁড়াও', শোন! বয়েসে ছোট হলেই কোন মেয়েকে আমি বোন বলে ভাবতে পারি না। তাই তোমার দাদা আমি হতে পারব না' রাজর্ষি বলে।

যা বাবা! যার সম্পর্কে ফোলান বেলুনের মত আইডিয়া ছিল ওর সে কিনা এত অভদ্র, কিন্তু উজানীও কি কম যায়? বলে, 'শুনুন মি: মিত্র, এটা বস্টন নয়, কোলকাতা। এখানে বান্ধবীর দাদাকে দাদা বলাই নিয়ম। এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনি কোলকাতার জল-হাওয়ায় বড় হননি, বস্টনেই জন্মেছেন। আপনি একটা... উজানীকে থামিয়ে দিয়ে রাজর্ষি বলে,'দ্যাখো তিল তোমার বাড়িতে কি দাদা নেই? যে আমায় দাদা বানাচ্ছ?'

'আমার নাম উজানী ভট্টাচার্য। তিল নয়,' যা দেখছি, আপনি অতি অভদ্র। ওমন ভাল বোনের এমন দাদা! উজানী না বলে পারে না।

ওদের ঝগড়া আরো কিছুক্ষণ চলত যদি পরমা এসে হাজির না হত। 'দাদা তুই থামবি? কি রে তুই, ছিঃ ছিঃ।

রাগে লাল হয়ে উজানী ওখান থেকে চলে যায়।

এর ঠিক কদিন পর উজানীর রাস্তা আটকায় রাজর্ষি। 'আমি সরি বলছি, ক্ষমা না করা পর্যন্ত রাস্তা ছাড়া যাবে না।'

সিনক্রিয়েটের ভয়ে উজানী বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি যান প্লিজ।'

'যাব বলে তো আসিনি তিল। ও, তিল বললে তো তুমি আবার রেগে যাও।' কিন্তু কি করব বল? তোমার ভ্রূয়ের মাঝখানে এমন একটা বেখাপ্পা তিল যে ঐ নামটা এসেই যায়। রাজর্ষির মুখে মিটিমিটি হাসি। যা বলতে এসেছি, 'পরমা কদিন কলেজ আসবে না। বাড়িতে পুজো আছে পরশুদিন। এসো কিন্তু । পরমা বার বার বলে দিয়েছে। রাজর্ষি বলে।

'আপনি একটা ঢ্যাঙা, দাড়িমুখ ভর্তি একটা হুমদো।' এটা আমায় 'তিল' বলার জবাব। 'দয়া করে এবার আসুন'। আমি অবশ্যই যাব। আর হ্যাঁ, 'আমায় কিছু বললে চুপ থাকার মেয়ে কিন্তু নই। উজানীও তড়পায়।

একটানা বসে পা-টা ধরে গেছিল উজানীর। ও পা-টা টান করে। আজ এই বাড়িতে, রাজর্ষির ঘরে ও আছে। অথচ রাজর্ষি নেই। সেই পুজোর দিন রাজর্ষি ওকে সবার চোখের আড়ালে এই ব্যালকনিতে নিয়ে আসে। বলে, 'তিল হয়তো জানে না আপাতত আমি এখানে একটা কলেজে জয়েন করেছি। তোমায় ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই।'

তুমি ব্রাহ্মণ আর আমি কায়স্থ। এই টুকু-ই যা বাধা। 'তোমার আপত্তি নেই তো তিল?' বলেই রাজর্ষি ওর দুই ভ্রুর মাঝখানে তিলটা ছুঁয়ে দেয়। সম্বিৎ ফেরে উজানীর। রাজী আবার নয়?

'আমায় বিয়ে করতে হলে কিন্তু তোমায় দাড়ি কাটতে হবে।' উজানী হেসে ফেলে।

'ও, তাহলে তুমি রাজী?' বেশ বিয়ের দিন কাটব। উজানী রাজর্ষির বুকে মাথা রাখে।

আর ব্যালকনিতে বসা যাচ্ছে না। খুব মশা। ঘরে এসে বোতল খুলে জল খায় ও। বড় ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়ায়। আবার সেই পুরোনো কথা। পরমাই উজানীর হোস্টেলে ফোন করে বলেছিল যে ও আর কাকীমা চুঁচুড়ো গেছেন আর ওদিকে রাজর্ষির খুব জ্বর। উজানী যেন একটিবার ও বাড়ি যায়। বুকে একটা আনন্দের ঢল আছড়ে পড়েছিল ওর। ফাঁকা বাড়িতে ও আর ওর রাজর্ষি। তখন ও কি জানত যে কী

অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য!

ফ্ল্যাটের দরজাটা ভেজান। একটু ঠেলতেই খুলে যায় দরজাটা। রাজর্ষি হয়তো দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে রাজর্ষির বেডরুমের দিকে। পায়ের তলায় মাটি সরে যায় ওর। একই বিছানায় রাজর্ষি আর কাজের মেয়ে ঝুমুর। সিনেমা-সিরিয়ালে এসব সিনে কাজ পড়ার মত কিছু দেখান হয়।

'ঝুমুর, ঝুমুর, চিৎকার করে উঠে উজনী।' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামে ঝুমুর। বলে—

'দিদি আপনি যা ভাবছেন তা নয়। বিশ্বাস করুন'। 'ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।' বিছানায় পড়ে থাকা ওড়নাটা নিয়ে ঝুমুর চলে যায়।

টকটকে লাল চোখে, টলতে টলতে রাজর্ষি এসে দাঁড়ায়। অস্ফুটে কিছু বলার চেষ্টা করে। উজানী শোনার চেষ্টাও করে না। শুধু বলে, 'আজকের পর থেকে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না। আর বিয়ের কথা তো ভুলেই যাও।'

সেই শেষ উজানীর এ বাড়িতে আসা। আর আজ এতগুলো বছর পরে এই বাড়ি, এই ঘর আর এই বিছানা। একটা দীর্ঘশ্বাস উজানীর বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

এবার ও বিছানায় এসে বসে। রাজর্ষির বালিশে হেলান দেয়। রাজর্ষির চিঠিটা একবার পড়তে হবে। পরমার জন্যই পড়বে ও। খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে উজানী। চিঠিটা পড়তে শুরু করে ও।

তিল,

এর আগে তোমায় বহুবার চিঠি দিয়েছি, বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষমেষ তা বাস্তবায়িত হয়নি। থাক সে কথা। রমাকে বলেছিলাম, আমি মারা যাওয়ার পর যদি তোমার সাথে ওর দেখা হয়, ও যেন খামটা তোমায় দেয়। আর যদি তুমি আমার এই শেষ চিঠিটুকু ছিঁড়ে না ফেলে পড়, তাহলে অন্তত তুমি 'এই দাড়িমুখো হুমদো' কে মন থেকে ক্ষমা করে দেবে।

ভীষণ জ্বরের ঘোরে হয়তো আমার ভুল করা আর তোমার চোখে দেখা কিছু সত্যি দুইয়ের বিক্রিয়ায় আমাদের রাস্তাটা দুদিকে চলে গেল; তিল'। প্লিজ ভেবো না, যে রাজর্ষিটা আবার এসব কেন বলছে। তোমার মন রাখার জন্য কিছু বলছি না বিশ্বাস কর। দু-হাতে ইন্‌জেকশনের বড্ড ব্যাথা। লিখতে কষ্ট হয়।

ঐদিন ভীষণ জ্বরে বার বার তোমার নামটা নিচ্ছিলাম 'তিল'। আর ঝুমুর আমায় জলপট্টি দিয়ে দিচ্ছিল। এরপর আমার আর কিছুই মনে নেই। তুমি আমায় একশো তিন ডিগ্রি জ্বরে ফেলে চলে গেলে 'তিল'? সেদিন আমি ঝুমুরের সাথে কি করেছিলাম বা কতটা এগিয়েছিলাম জানি না। তবে একথা আমি ঝুমুরকে জিজ্ঞেস করতেও পারিনি। আমার রুচিবোধে বেধেছিল। এতদিন পর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস তোমার কাছে।

এবার একটা বাস্তব কথা বলি তিল। ছেলেরা এরকম ভুল মাঝে-সাঝে করে ফেলে। হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবেই করে। আর আমি এটাও মনে করি যে, মেয়েরা তাদের ক্ষমাসুন্দর মন দিয়ে ছেলেদের ক্ষমাও করে দেয়। তবে আমার বেলায় তুমি আর একটু নরম হলে না কেন 'তিল'?

সেদিনের কথা বাড়ির কাউকে জানাওনি তুমি। আমার সম্মান রক্ষা করেছিলে। কিন্তু আমি চাই না আমার মত 'চরিত্রহীন, লম্পট, অপদার্থকে কেউ সম্মান করুক। সকলের জানা উচিত ড. রাজর্ষি মিত্রের আসল চেহারাটা। তাই পরমাকে সব বলে গেলাম।

পারলে আমায় ক্ষমা করে দিয়ো। আর ভালো থেকো।

রাজর্ষি

তারিখ - ০২।১০।১০

তারমানে মারা যাবার মাত্র দশ দিন আগের চিঠি।

'কি আশ্চর্য! এতখানি অবজ্ঞার পরও রাজর্ষি ওর প্রতি এতখানি দায়বদ্ধ ছিল?' স্বগতোক্তি করে উজানী। আর ও। চিঠিটা শেষ করে উজানী দুহাতে ওর কপালের রগদুটো চেপে ধরে। দপদপ করতে লাগে মাথা-কপাল। এত বোকা সে, ছি: ছি:। একবার যদি রাজর্ষির কথাগুলো শুনত। চিঠিটা দলা পাকিয়ে বিছানার-ই একপাশে ছুঁড়ে দেয় উজানী।—

'কী দাম এই চিঠিটার, মানুষটাকেই যখন বিশ্বাস করেনি।'

এই ঘটনার পর ছেলেদের কী নিদারুণ ঘৃণা করে এসেছে, উজানী কাউকেই বিশ্বাস করেনি। করতে পারেনি। রাজর্ষির ঘরের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করে চারটে বাজে। চট করে ব্যাগটা দেখে নেয় ও। বাথরুমে যায়। ঘরে এসে শাড়ি পড়ে। ফ্রিজের উপর থেকে ডায়রি আর পেনটা নামায়। ডাইনিং টেবলে রেখে লিখতে শুরু করে—

রমা,

আমি চলে গেলাম রে। পরমা তোদের সামনে দাঁড়ানোর মুখ নেই রে আমার। আজ আমি সাঁইত্রিশ বছরে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস ভাল-ই বুঝেছি, জানিস। মানুষের যা কিছু খারাপ, নষ্ট বা কলুষিত, তা হল মানুষের মন। শরীর নয়। এটাই বাস্তব। বাকী সব মিথ্যে। আর আমি সেই অত্যন্ত খারাপ আর নষ্ট মনের-ই মেয়ে। হ্যাঁরে, আমি ভুল ছিলাম। তুই ঠিকই বলেছিস। তাই আমায় কখনো ক্ষমা করিস না। আমার ঘৃণা নিয়ে রাজর্ষি যেমন চলে গেল, তোদের ঘৃণা কুড়িয়েই যেন আমি বাকী জীবনটা কাটাতে পারি। হয়তো সেটাই হবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

তোদের উজানী।

লেখা শেষ হলে ও কপালের বড় টিপটা খুলে চিঠিটা ফ্রিজে সেঁটে দেয়।

শেষবারের মত রাজর্ষির ঘরে ঢোকে ও। বিছানা, বালিশগুলোকে স্পর্শ করে। ভেতরটা কান্নায় ভিজে যেত উজানীর, তবু চোখ দুটো খটখটে শুকনো। ট্রলিটা ঠেলে ঘর থেকে বেরোয় ও। ড্রয়িং রুমে রাখা রাজর্ষির ছবিটার দিকে ওর চোখ যায়। ছবিটা যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আর ওকে জিজ্ঞেস করছে, 'তিল, চলে যাচ্ছ?'

'না রাজর্ষিদা, চলে নয়গো, আমি পালিয়ে যাচ্ছি'।

দরজাটা আস্তে আস্তে খোলে ও, ট্রলিটা বের করে, রাজর্ষির ছবিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে। আর খানিকক্ষণ পর ঐ হাউসিং ছেড়ে।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় 'তিল'। কোলকাতার পূব আকাশ তখন সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে।

ক বি তা

শূন্যতা

সুভাশিষ দাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

ছিন্ন-ভিন্ন হৃদয়, চারিদিক শুধু বালুময়
কোথাও একটু শান্তি-স্বস্তির বাতাস নেই।
শুধু আছে ধূ ধূ করা মাঠ
আর মানুষজনের গঞ্জনা।

চারিদিক থেকে ছুটে আসে উষ্ণ বাতাস
যেটুকু ভালোবাসা ছিল, তাও অকালে শেষ।
সব, সব শেষ হয়ে গেছে আজ নিঃশেষে
তবুও আশার আলো জেগে থাকে দিগন্তের কোণে।

না থাকার সেই দিনগুলি

প্রিয়াঙ্কা দাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

যখন আমি চলে যাব
তখন কি দুঃখ পাবে না
জানালায় উঁকি দিতে গিয়ে
মনে কি পড়বে না সেই লুকোচুরি খেলা?
দিনান্তে কর্ম সেরে ক্লান্ত দেহে
যখন ফিরবে গৃহে
তখন উঠোনের চাঁপাগাছটিতে
ফুটন্ত চাঁপাগুলি পড়ে থাকতে দেখে
তুমি কি উদাস হয়ে পড়বে না?
খুঁজে ফিরবে না আমায়?
আমি কি তলিয়ে যাব
বিস্মৃতির অতল গহ্বরে?
তবুও কি কোথাও রব না আমি
হেমন্তে ঘাসের ডগায় একফোঁটা
শিশিরবিন্দু হয়ে?
শরতের মেঘ, বসন্তের
মন কেমন করা বাতাস,
কোকিলের ব্যাকুল করা কুহু কুহু ডাক
কিছুই কি উন্মনা করবে না তোমায়?
এমনকি নীরবতাও তোমায়
জানান দেবে না, আমি ছিলাম
কোথাও, কোনোখানে ...!!!

আমরাও পারব

দেবারতি সিংহরায় (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাম্মানিক)

মন আছে, দেহ আছে,
একটা জীবন আছে।
কেন পারব না? ...
প্রতিবার যে ফার্স্ট হচ্ছে
সেও এক আমিও এক,
আমিও পারব, তোমরাও পারবে।
বাবার স্বপ্ন, নিজের স্বপ্ন,
হাতের মুঠোয় না রেখে
মুঠো খুলে দাও।
স্বপ্ন ভাসুক বাতাসে!
শিক্ষা কখনো নিজে কাছে আসে না,
তাকে নিয়ে আনতে হয়।
শিক্ষা আনে চেতনা,
চেতনা আনে বিপ্লব,
বিপ্লব আনে মুক্তি—
আর আমরা সেই মুক্তির দূত।।

বনের পাখি

লক্ষ্মী মণি সরকার (বি.এ. প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাম্মানিক)

বনের পাখি ডাকা ডাকি
করছ কেন বলো।
সোনার খাঁচায় রাখব তোমায়
থাকবে ঝলোমলো।।
কচি কচি কোমল গায়ে
বুলিয়ে দেব হাত।
আদর করে সাথে সাথে
রাখব দিন রাত।
পাকা পাকা মিষ্টি ফল
তোমায় দেব খেতে,
সন্ধ্যেবেলা ঘরে তুলে
বিছানা দেব পেতে।
মা বলেছে কারও প্রাণে
কষ্ট দিতে নাই।
বাসতে ভালো তোমায় পাখি
তাই-তো আমি চাই।।

পরীক্ষা

আবিদা সুলতানা (প্রাক্তণ ছাত্রী)

পরীক্ষা ভাই এসে গেছে
ফাঁকি দিলে চলবে না,
বইয়ের পাতা ছিঁড়ে শুধু
নকল করা চলবে না।
সাদা খাতা জমা দিলে
স্যারতো ক্ষমা করবে না,
ভবিষ্যতের চিন্তা করে
শূণ্য পাওয়া চলবে না।
অনেক ভেবে ঠিক করেছি
খেয়ে আদা জল,
উপরে যেতে হবেই আমায়
মনে এল বল।

বাবার প্রতি

পারমিতা দাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ)

জানো বাবা, তোমায় ছাড়া
বাড়িটা আজ বড় ফাঁকা লাগে।
সারাক্ষণ তোমার স্মৃতিগুলো
মনের মধ্যে জাগে।

এ পৃথিবীতে বাবা নেই যার
সেই শুধু বোঝে কষ্ট তার।
সবকিছু থেকেও বাবার জন্য
মনটা করে হাহাকার।

তবু, আমি মনে করি—
আমি অনেক ভাগ্যবান
যে বাবার সাথে কাটিয়েছি
আমার অবুঝ বাল্য-কৈশোর।
এজগতে হয়তো এমনও অনেকে আছে
যারা এখনো বোঝে না
বাবার কতটা কদর।

বাবা, আমি তোমাকে হয়তো
কখনই বলিনি আমি তোমাকে
কতটা ভালোবাসি।
মায়ের থেকে একটু মানি কম
কিন্তু বাকী সবার থেকে বেশি।
আমি তোমায় বড্ড ভালোবাসি।।

রামকৃষ্ণদেব

সুরজ আলম

ও আমার ধ্যান মগ্ন রামকৃষ্ণ গুরু,
তুমি না থাকলে এই আঁধারে, কে জ্বালত বলো আলো?
শত শত প্রণাম জানাই তোমার-ই চরণতলে
ভাগ্য আমার পেয়েছি আশ্রয় তোমার এই কোলে।
বললে তুমি, 'যতমত ততপথ,' ভগবান আল্লাহ সবাই এক
কেউ যদি তফাৎ খুঁজিস ভুবনটা ঘুরে দেখ।
সাধনা করে গেলে তুমি চিরটা জীবন
যার দ্বারা করলে তুমি মানুষকে আপন।
গড়লে তুমি বীর-পুরুষ, বিবেকানন্দ
যার কৃতিত্বে সারা দেশ আজ করে আনন্দ।

কবিতায় আমি

মানজারুল ইসলাম (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

মেঘলা দিনের আড়ালে
কবিতা লেখি আনন্দে, নির্জনে
বৃষ্টি বাদল নাচছে ঝমঝমিয়ে
কবিতার নৃত্যচপল ছন্দে।

জমকালো মেঘ চারিদিকে
অন্ধকারে ঢাকা,
মোমের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছি,
আনন্দে আত্মহারা।।

ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি ঝরেছে
মনের অলিতে গলিতে।
কবিতা লেখার আবেগ বেড়েছে
বর্ষণ-সঙ্গীতে।

কবিতা আমার দুঃখের ধন
আমি কবিতায় মাতোয়ারা
কবিতায় আমি পাগল প্রেমিক
কবিতা মেটায় বুকের জ্বালা।।

যন্ত্রণা মোর ভেজায় বুকের
বৃষ্টি ফোঁটার বিন্দু,
মেঘের চালির কালোবেণী হয়
কবিতার মহাসিন্ধু।।

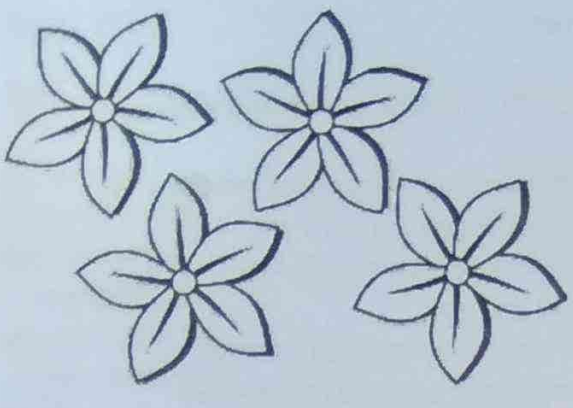

শুধু তুমি

ওয়াসিম আকরাম (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ)

নির্জন ঘন এক অন্ধকারে,
চেয়ে দেখি—
কেউ নেই,
রাত্রি হয়ে
শুধু তুমি।।
প্রভাতের মন কুয়াশার আড়ালে
চেয়ে দেখি—
কেউ নেই,
শিশির হয়ে
শুধু তুমি।।
মন কালো মেঘের আড়ালে
চেয়ে দেখি—
কেউ নেই,
বৃষ্টি হয়ে,
শুধু তুমি।।
দূরে মরুভূমির প্রান্তরে,
চেয়ে দেখি—
কেউ নেই,
বালি হয়ে,
শুধু তুমি।।
রাতের পূর্ণিমার আকাশে,
চেয়ে দেখি—
কেউ নেই,
জ্যোৎস্না হয়ে,
শুধু তুমি।।
মনের তৈরি কঠিন হৃদয়ে,
চেয়ে দেখি—
কেউ নেই,
ভালোবাসা হয়ে,
শুধু তুমি।।

লুকানো স্বপ্ন

অনিতা দাস (বি.এ. প্রথম বর্ষ, দর্শন বিভাগ)

আমার ভোরবেলার স্বপ্ন চুরি করে
যতই দূরে তুমি যাওনা সরে।
অস্তগামী সূর্য যখন দিগন্তরের পারে
তুমি মনে পড়বে বারে বারে।

তোমার চলার পথে বিছানো সবুজ শ্যামল পাতা
সেই পাতা দিয়ে রয়েছে আমার জীবন গাঁথা।
তোমার স্মৃতি দিয়ে যখন গাঁথবো নক্সী কাঁথা
সেই কাহিনী পড়ে তোমার মনে লাগবে ব্যথা।

আমার একার চলার পথে তোমার ছিল অভাব
কত প্রশ্নের উত্তরে তুমি এখনও দাওনি জবাব
কবে তুমি পাল্টাবে তোমার চাপা স্বভাব।
কতবার আড়ি করেছো তুমি কতোবার করো ভাব।

অমাবস্যায় যখন পৃথিবী ঢাকে অন্ধকারে
কখনও কি আমার মন তোমায় ভুলতে পারে?
এত কাছের ভেবেছি আমি সারা জীবন যারে
আমার স্বপ্ন ফিরিয়ে দিলাম, তোমারই অন্তরে।

হয়তো বা

চৈতালী প্রামাণিক (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

জানি দেখা হবে
হয়তো বা ভুলেও যাবে,
তবু একটা অনুভূতি
মনে রয়ে যাবে।
পথ চলবে যখন তুমি
তোমার চোখে চেয়ে
পুরোনো দিনের কথা
আসবে মনে ধেয়ে।
বাঁধবে নাকো চোখের জল
তোমার দিকে চেয়ে
আশায় থাকবে মনটা আমার
তোমারই পথ চেয়ে।
তবু মন বলে যাবে
হয়তো দেখা হবে
কিম্বা এমন হতেও পারে
হয়তো ভুলে যাবে।

স্মৃতিগুচ্ছ

সুস্মিতা সরকার (বিদায়ী ছাত্রী)

জানি, দুষ্টু-মিষ্টি সময়গুলি
আসবে না আর ফিরে,
তিক্ত মধুর স্মৃতির রাশি
কখনো ফিরবে কি রে।
কাছে এসেছে দূরেও গেছে
কত আপনজন!—
গড়েছে আর ভেঙে গেছে
সবার হৃদয় মাঝে আমি
জাগিয়ে যাও গীতি,
দুঃখ সুখের ছবি গুলো
হবে শুধুই স্মৃতি।।

তুমি চলে গেলে

মানজুলা খাতুন (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

তুমি এসেছিলে—
সকালের রক্তিম সূর্য হয়ে,
আমায় আলোয় ভরিয়ে দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস হয়ে,
আমায় ছুঁয়ে দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
বিকেলের রামধনু হয়ে,
আমায় রাঙিয়ে দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
ঘন অন্ধকারে জোনাকি হয়ে,
আমায় পথের দিশা দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে,
আমার জ্যোৎস্নদিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টি হয়ে,
আমার মন ভিজিয়ে দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
রজনীগন্ধা হয়ে,
আমার সুবাস দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

তুমি এসেছিলে—
শীতের চাদর হয়ে,
আমার উষ্ণতার পরশ দিয়ে
তুমি চলে গেলে।

আশা

শ্বেতা কর্মকার (বি.এ. প্রথম বর্ষ, দর্শনে সাম্মানিক)

শুনেছি অন্ধকারের বুক চিরে আলোর মশাল হাতে
সূর্য আসে। যুগযুগান্ত ধরে সংগ্রাম তার,
মেঘের প্রাচীর ঘিরে ঝড় জল বৃষ্টির সঙ্গে
জীবনের প্রয়োজনে।
জীবন আমার জলের মত। মাটির মত রমণীয়।
অমাবস্যার অতৃপ্ত ডানা ভেঙে জ্যোৎস্না রাতের
শিশিরের উন্মাদনায় মুক্তির ক্রন্দন বিড়ম্বনা বাড়ায়।
তবু ভালোবাসার পালক খোঁজে সন্ধানী এই মন।

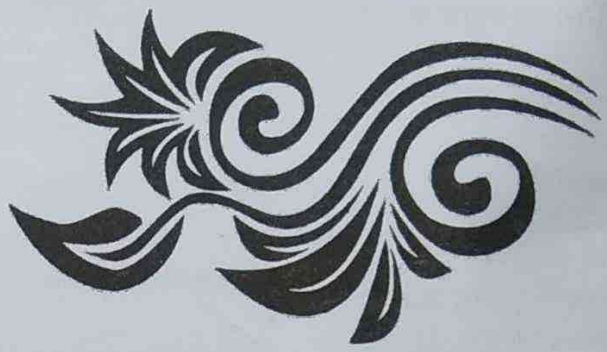

বেলা যায়

নারায়ণ বিশ্বাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

প্রভাত কালে পূর্বদিকে
উদয় হল রবি,
যেদিকে তাকাই, সে দিকে দেখি
সোনার আলোর ছবি।

চারিদিকে হায়, যেন মনে হয়
সোনালি রঙের খেলা,
এভাবেই যেন, ধীরে ধীরে চলে
যায় জীবনের বেলা।

যখন সূর্য মাথার উপর
করে তাপ বিকিরণ।
মনে হয় যেন জীবনের বেলা
হয়েছে নিষ্ক্রমণ।
ধীর মধুর আলোয় রবি
যখন অস্তাচলে।
জীবনে ঘনায় সন্ধ্যা আঁধার
মরণ মায়ের কোলে।।

আয় বসন্ত

রিমি মন্ডল (দ্বিতীয় সেমিস্টার, ভূগোল অনার্স)

আয় বসন্ত আয়
নীল দিগন্ত জুড়ে।
ছুঁইয়ে দে আজ তুই
পরশমাণিক ওরে।
ফুলের হাসির ছলে
যাস না আমায় ভুলে।
স্বপ্ন নিয়ে তোরই
দিয়েছি দ্বার খুলে।।
একটু নে জড়িয়ে
ফুলের ছোঁয়া দিয়ে।
মৌমাছির গুঞ্জনে
আমায় সাথে নিয়ে।।
ডানা মেলে এসে,
রইলি হৃদয় ঘেঁষে।
সুখের সাগর মাঝে
প্রিয়তমের বেশে।।

বৃদ্ধাশ্রম থেকে

তনুশ্রী দাস

খোকা আমার বড়ো হবে, হবে সে এক মানুষ,
যার মধ্যে ভক্তি নিষ্ঠা আর থাকবে হুঁশ।
যখন খোকা খুবই ছোট, বলত আমায় এসে,
এটা কী মা, ওটা কী মা? উত্তর দিতাম হেসে!
একটু আড়াল হলেই খোকা ব্যাকুল হত মন,
মনে হত তাকে যেন দেখিনি কতক্ষণ।
আমায় ছাড়া খোকা, খেত না কোনোদিন,
আমার চরণধূলি সে নিত প্রতিদিন।
দেখতে দেখতে আমার খোকা, হল মস্ত বড়ো,
চোখের সামনে দেখতে পেলেই বলত 'তুমি সরো'।
একটা কথা দু'বার যদি শুধোই আমি তাকে
রেগে গিয়ে তখন সে যে তাকাত আমার দিকে।
আমার কথা তোর কি খোকা, পড়ে এখন মনে?
তোর ভালো চাই সকল সময় শয়নে-স্বপনে।
খোকা আমার সদাই যেন, থাকে দুধে ভাতে,
ঈশ্বরের কাছে এই মিনতি করি দিনে রাতে।
তোর তো এখন অনেক নাম, চড়িস বাসে ট্রামে,
তোকেও যেন না হয় আসতে, এই বৃদ্ধাশ্রমে।।

'শপথ'

জাসমিগ ইসলাম (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ)

মুটে-মজুর যারা,
দীন ফকির তারা
ওরা কেন সর্বহারা?

দেহের কত রক্ত হল জল
হায়রে অভাগা দুর্বল—
চোখে ভরে এল জল।

শোন্‌রে, পিশাচ মালিকেরা—
আর কত দিন থাকবে বন্দী— কারাগারে তারা।
ধ্বনিবে আহ্বান—
ধর্ম, জাত, বিভেদ নাই।
লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই
লড়াই করে বাঁচতে চাই।

পরিবেশ ও মানুষ

আশিক ইকবাল (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব যে,
জীবনে চলার পথে,
প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে
সুখ-স্বাচ্ছন্দ পরিবেশ যাবো গড়ে।
কারণ বিশ্ব জুড়ে নামিয়াছে, বিপদের তরবারি
আর আকাশে বাতাসে ভরে গেছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।
অন্যদিকে শহরের আনাচে-কানাচে ভরে গেছে জঞ্জালে—
যার প্রতিটি বিষ ছড়িয়ে পড়েছে স্থলে-জলে-ভূমিতলে।
তবু বলতে পারি, আরো কিছু দিন রইবে বসুন্ধরা
যদি মানুষ মুখ তুলে করে একটুকু শুধু দয়া।
দিকে দিকে বিশ্ব জুড়ে চলুক অভিযান,
তাতে যোগ দিক হাজার লক্ষ বিপ্লবী জনগণ।
রুক্ষ মাটিতে সেদিন মানুষ করুক বৃক্ষ রোপণ
সুন্দর হয়ে উঠুক মোদের ধুসর ধুমল ভুবন।

অথৈ জলে নিথর দেহ

মোবারক হোসেন (বিদায়ী ছাত্র)

১.

ভোর-রাত শিশিরে
হিমের কুয়াশায় পুকুর ও নদীর—
জলে শীতের— চাদরে— মৃদুমন্দ বাতাস,
তখনও জলে কেউ নামেনি।
কেউই নামেনি,
জলচর— প্রাণী ছাড়া।
ভোর-রাতে হিমের পরশে আমলকি বনে
কিচির মিচির আওয়াজ, কলকল রব।
কতকগুলি ডানাওয়ালা পাখি বন্ধু
ঠক্‌ঠক্ করছে মিষ্টি রোদের আশায়।

২.

সকাল সকাল শীতের— চাদর — উড়িয়ে
কতকগুলি যাত্রী-যান দ্রুতবেগে
ছুটে চলেছিল আপন আপন কাজে।
চলছিল বাস সড়কপথে গন্তব্যস্থলে।
কেউবা হয়তো প্রিয়জনকে অনলাইনে
পেয়ে হাসি মুখে জানিয়েছিল—
'এই পৌঁছব কিছুক্ষণ পরে', ফিরতে
রাত অন্ধকার হয়ে যেতে পারে।
কেউবা ও-প্রান্তে হাসি বিলিয়ে দিয়ে—
বলেছিল সোনামানিকে
স্কুলে পৌঁছে দিও ঠিকভাবে,
আমি ফিরে— সবাই মিলে রাতে
আহার— সরব একসাথে।

৩.

জানালার ধারে— চাদর— গায়ে দিয়ে
চাষী ভাই গালে হাত রেখে
ভাবছিল, একমনে ক্ষেতের ফসলগুলি
এবারে ভালো যেন ফলে;
আহার— তুলে দিতে হবে পরিবারের মুখে।

৪.

চলন্ত বাসে স্টিয়ারিং-এর দিকে
তাকিয়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকা বই
হাতে নিয়ে ভাবছিল কখন
পৌঁছব? স্কুলে গিয়ে 'ইলিয়াস',
'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন' ভালোভাবে
পড়াতে হবে। আজকের দিনটা
শুরু হবে অন্যযাত্রাপথে।

৫.

গাড়ি চাকা দ্রুত ব্রিজের উপরে—
পদার্পণ করেছে, চলন্ত গাড়ি,
ঠাণ্ডা হাওয়া; গাড়ি থেকে দেখা যাচ্ছে
ঐ নদীর জলে এখনও কুয়াশা
চাদর গায়ে হিমানীর মতো ঘুমিয়ে আছে।
হঠাৎ দুম্ দাম্ একী ই ই ই ? একী ই ই ই ?

হঠাৎ আতঙ্ক নেমে এলো
ব্রিজের উপরে !! একী ??
কী হলো? চারদিকে অন্ধকার!
মাঝ নদীতে, ভৈরব নদীর জলে
তলিয়ে গেল কতকগুলি জলজ্যান্ত টাটকা দেহ!!!
কাল যে ছিল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা,
চাষীভাই, বিভিন্ন জীবিকার মানুষ,
আজ হয়ে গেল
ঐ অথৈ জলে নিথর দেহ !! নিস্পন্দ লাশ!!
ভয়ংকর— মর্মান্তিক আতঙ্ক!
চারদিকে কান্নার কলরোল!

৬.

সত্যি! কতকগুলি লাশ কাছি দিয়ে
তুলে আনতে গভীর অন্ধকার
হয়ে গেল!
নিজের নিজের গন্তব্যে পৌঁছালো না কেউ!
অন্যপথে যাত্রা শুরু হল—
সকলেই পৌঁছে গেল অন্তিম গন্তব্যে।

‘ধর্ষণ খুন ও প্রতিরোধ’

মোজাম্মেল হক

ধর্ষণ একটা অপরাধ। জঘন্য অপরাধ। বিকৃত কামুক পুরুষরা এটা ঘটায়। বিকৃত যৌন লালসা থেকে এর উৎপত্তি। ধর্ষণ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে হয়ত। বর্তমানে ধর্ষণ সমাজে, রাজ্যে, দেশে, বিদেশে চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সমাজের কলঙ্ক, দেশের লজ্জা

পৃথিবীর আতঙ্ক। ধর্ষণ আজ আমার আপনার সকলের ঘরের মা, মেয়ে বৌদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ধর্ষণ করার পর খুন আর একটি অপরাধ। জঘন্যতম অপরাধ। দেশে দেশে এর প্রকোপ ও মহামারীর মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। একে রুখতে হবে।

১. ধর্ষণের পর খুন রুখতে প্রথমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কঠোর আইন বলবৎ করা দরকার। যাতে কোন ভাবেই ধর্ষক আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।

২. ধর্ষক প্রমাণিত হলেই তাকেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ধর্ষককে দিতে হবে যা দেখে বা শুনে অন্যরা ভয়ে ভীত হয়ে আর যেন সে পথে কেউ না হাঁটে।

৩. মহিলা সংগঠন গড়তে হবে। শক্তিশালী মহিলা সংগঠন বিভিন্ন পর্যায়ে থাকবে। এবং তাদেরকে সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। কোন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করবে।

৪. মহিলা সংগঠনগুলির হাতে সরকারী যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে। ধর্ষক ও দুষ্কৃতিদের ধমক বা হুমকি দেখে তারা যেন ভয়ে ভীত হয়ে না পড়ে।

৫. বিচারের ক্ষেত্রে কোর্টে ধর্ষণের বিচারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোর্ট, কাছারী, রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা একে যেন ঠেকাতে না পারে। মনে রাখতে হবে ধর্ষকরা কোন না কোন গুন্ডাদের অথবা রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে তারা নিজেকে মস্তান ভাবে।

৬. মহিলাদের চলাফেরা ও গতিবিধিতে সতর্কতা বাড়াতে হবে। যে সমস্ত জায়গা বিপদ সঙ্কুল বা দুষ্কৃতিদের আড্ডাখানা সেখানে দলবদ্ধভাবে অথবা মেয়েদের প্রোটেকশন সহ যেতে হবে। তথাপি কোন বিপদের সংকেত পেলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় ও মহিলা সংগঠনকে জানাতে হবে। যাতে দুষ্কৃতিরা কোন ভাবেই গা ঢাকা দিতে পারে।

৭. সর্বোপরি সমাজের সকল মানুষকে ধর্ষকদের মত অপরাধীকে চিহ্নিত করণ, বয়কট এবং পাড়ায় পাড়ায় ধর্ষক বিরোধী দল গঠন করে, থানায়, কোর্টে ধর্ষকদের শায়েস্তা করার চেষ্টায় থাকতে হবে।

৮. মেয়েদের ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। যে সমস্ত মেয়েদের যখন তখন, যেখানে সেখানে কাজের জন্য যেতে হয়ে, তাদের কিছু কিছু এমন কলাকৌশল জানা দরকার, যাতে প্রাথমিকভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। প্রয়োজনে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের কাজে নামতে হবে। যাতে সহজেই কোন ধর্ষক আক্রমণ করে কোন মেয়ের ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

৯. ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বগৃহে পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে, সভাসমিতিতে ‘ধর্ষণ এক জঘন্য অপরাধ’ এ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ধর্ষণমূলক অপরাধে জড়ালে জীবনে কোন দিন কোন ভাল জায়গায় স্থান পাবে না, সকল কিশোরের মনে এই শিক্ষার বীজ ঢোকাতে হবে। যাতে কোন কিশোর ঐ পথে পা না বাড়ায় সে ভয় তার মনের মধ্যে ঢোকাতে হবে।

১০. প্রমাণিত ধর্ষককে কঠোর শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা প্রাণদণ্ডই যথেষ্ট নয়। আগামীতে প্রয়োজনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আরও কঠিন ব্যবস্থা হওয়া দরকার। যা সমাজকে ধর্ষণ ও খুন মুক্ত করবে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায়

অজিত চৌধুরী (ইতিহাস বিভাগ)

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত দিগ্বিজয়ী বীরের আবির্ভাব হয়েছে ম্যাসিডন অধিপতি ফিলিপের পুত্র মহাবীর আলেকজান্ডার তাদের মধ্যে অন্যতম। এক বা একাধিক মহাদেশে যাঁরা ঝড়ের গতিতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন, যাদের নাম কিংবা স্মৃতি আজও মানুষের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে তারাই দিগ্বিজয়ী। এ রকম কয়েকজন দিগ্বিজয়ী বীর হচ্ছেন কার্থেজের বিখ্যাত সেনাপতি হালিমকারের পুত্র হানিবল, রোমান সম্রাট সিজার, মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খাঁও তৈমুর লং, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন। এই সমস্ত বিশ্বত্রাস দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন মহাবীর আলেকজান্ডার। সারা পৃথিবী বিশেষ করে ভারতীয়দের কাছে তিনি একজন দিগ্বিজয়ী লুণ্ঠনকারী হিসেবে পরিচিত হলেও আলেকজান্ডারের চরিত্রে যে বহু মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তা হয়ত অনেকের কাছে অজানা। আসলে আলেকজান্ডারের চরিত্র রহস্য তাঁর কালের কিংবা একালের কোন মানুষই বুঝতে পারেননি। আরিষ্টটল শিষ্য আলেকজান্ডারকে দিয়েছিলেন দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা। কিন্তু আলেকজান্ডারের কীর্তির কথা শুনে গুরু কম বিস্মিত হননি। মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে যে গ্রীক বীর আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজের পদানত করেছিলেন ভারতবর্ষে এসে যিনি তৈমুর লং ও নাদির শাহের মতই নৃশংস হয়ে দারুণ হত্যাকাণ্ড করেছিলেন সেই লোকই যে সময়ে অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ। আলেকজান্ডারের বিশ্ববিজয়ী বাহিনী তখন পারস্যে। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস পরাজিত ও নিহত। আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনী নদী-গিরি প্রান্তর অতিক্রম করে তখন মধ্য এশিয়ার দিকে এগুচ্ছে। লক্ষ্য ভারতবর্ষে পৌঁছানো। পারস্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আলেকজান্ডার হয়ত দেখতে পেয়েছিলেন নিজের জন্য একটি পথ, যে পথের শেষে ছিল এমন একটি মিলনক্ষেত্র, প্রতীচ্য যেখানে দাঁড়াতে পারে প্রাচ্যের হাত ধরে। এই পথে একদিন মধ্যাহ্ন এশিয়ার এক মরু প্রান্তরে তার সৈন্যবাহিনী শিবির ফেলেছে। আকাশে তখন জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে এসে লাগে যেন প্রখর অগ্নিবান। মধ্য এশিয়ার ধুধু বালুকাময় মরু প্রান্তরে কোথাও নেই এক বিন্দু জল। তৃষ্ণায় কাতর গ্রীক সৈন্যরা ধুঁকছে, তাদের জিভ গেছে শুকিয়ে। এমন কি ধারে কাছে কোন লোকালয়ও নেই। এমতাবস্থায় জনা

কয়েক সৈনিক মরুভূমির গর্তে হঠাৎ একটুখানি জলের সন্ধান পেলেন এবং একজন সৈনিক শিরস্ত্রাণে করে জলটুকু সংগ্রহ করে সেনাপতি আলেকজান্ডারের সামনে এনে রাখলেন। কারণ সৈনিকদের ধারণা রাজার দাবী আগে। আলেকজান্ডার তৃষ্ণার্ত ছিলেন। স্বভাবতই বিপুল আগ্রহে জলপান করতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেলেন শত শত তৃষ্ণাকাতর চোখ তার দিকে চেয়ে রয়েছে। আলেকজান্ডার দারুণভাবে বিচলিত হলেন এবং শিরস্ত্রাণ উঁচু করে সব জল মাটিতে ফেলে দিলেন। কী স্বার্থত্যাগ, কী মহত্ব।

কয়েক সৈনিক মরুভূমির গর্তে হঠাৎ একটুখানি জলের সন্ধান পেলেন এবং একজন সৈনিক শিরস্ত্রাণে করে জলটুকু সংগ্রহ করে সেনাপতি আলেকজান্ডারের সামনে এনে রাখলেন। কারণ সৈনিকদের ধারণা রাজার দাবী আগে। আলেকজান্ডার তৃষ্ণার্ত ছিলেন। স্বভাবতই বিপুল আগ্রহে জলপান করতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেলেন শত শত তৃষ্ণাকাতর চোখ তার দিকে চেয়ে রয়েছে। আলেকজান্ডার দারুণভাবে বিচলিত হলেন এবং শিরস্ত্রাণ উঁচু করে সব জল মাটিতে ফেলে দিলেন। কী স্বার্থত্যাগ, কী মহত্ব। সকলের আগে রাজার দাবি এই ঐশ্বরিক ফর্মুলায় তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। হাজার হাজার সৈনিক আলেকজান্ডারের নামে জয়ধ্বনি দিলেন।

উপরে উল্লেখিত শুধু একটি ঘটনাই। আলেকজান্ডারের মত একজন ক্ষণজন্মা বীরের মহৎ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি নয়, এরকম বহু ছোটো ছোটো ঘটনা তাঁর দুর্জ্ঞেয় চরিত্র রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করে। তাঁর জীবন চরিতে এমন সব কাহিনী দেখা যায় যার সংগে এই বিরাট পুরুষের চরিত্রে অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। সমরকন্দের এক ভোজসভায় তাঁর এক বন্ধু ক্লিটাসের সঙ্গে ঝগড়া এবং পরিণতিতে বন্ধুকে হত্যা করার পর আলেকজান্ডারের দারুণ অনুশোচনা হয় এবং অনুতাপে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অথচ এই লোকই তাঁর পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। প্রমাণ মহারাজ পুরু। এ প্রসঙ্গে আর একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি। পারস্যের রাজধানী তখন পার্সিপোলিস। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধনে সম্পদেপূর্ণ বড় হর্ম্যরাজি শোভিত এই নগরীর সৌন্দর্য পৃথিবীতে অতুলনীয় নগরের মধ্যে 'একচেতনায়' রাজ প্রাসাদ। জগতে অতুলনীয় তার কারুকার্য। বিরাট এই প্রাসাদ যেন পারস্য সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যের গরিমা। খৃঃ পূর্ব ৩৩৩ অব্দে ইসাস প্রান্তরের যুদ্ধে ৩য় দরায়ুসের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়ে গেল। থার্মোপলির গিরি সঙ্কটে পুরোনো অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রীক বাহিনী পার্সিপোলিস নগরী ধ্বংস করে রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিলেন। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে পারস্যের অতীত গৌরব। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিরাট শিল্পকলার প্রতীক পারস্যের রাজপ্রাসাদ। হঠাৎ আলেকজান্ডারের কি মনে হল কে জানে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈনিকদের ধ্বংসলীলা বন্ধের আদেশ দিলেন। ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদ গ্রীক সৈনিকদের রোষবহ্নি থেকে বেঁচে গেল। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় আলেকজান্ডার তাতার তৈমুর, পার্সী নাদির শা ও আফগান আবদালীর মত রক্তলোভী দিগ্বিজয়ী ছিলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হলেও আদর্শবাদী ছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ পেয়েও তিনি কোনদিন আত্মহারা হননি। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুষের সমাধি ভবনে উৎকীর্ণ একটি লিপি দেখে আলেকজান্ডার খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। শোনা যায়, এই লিপি পাঠ করে আলেকজান্ডার মনুষ্য জীবনের নশ্বরতা ও অনিশ্চয়তার কথা স্মরণ করে আবেগে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আলেকজান্ডারের কাহিনীর অবতারণা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দিগ্বিজয়ী বীর হলেও আলেকজান্ডারের চরিত্র মাধুর্য, তার উদারতা মানবতাবোধ অন্যান্য বীরদের থেকে অনেক উচুদরের ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের উপর রক্তাক্ত খড়্গ তুলে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, যাদের অভিযানের ফলে শুধু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে রক্ত সাগরের ঢেউ, বারংবার ভারতের সোনার ভান্ডার লুণ্ঠন করে যারা অদৃশ্য হয়েছেন দস্যুর মতন; আলেকজান্ডার সেই ধরণের বীর ছিলেন না। দিগ্বিজয়ী হলেও তিনি যে মানবতাবাদী ও আদর্শবাদী ছিলেন তার বহু প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে।

মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে (খ্রীষ্ট পূর্ব ৩২৩ অব্দের ১৩ই জুন) এই অসামান্য বীরের জীবন সূর্য প্রাচীন ব্যবিলনের প্রান্তরে অস্তমিত হয়। ২০ বৎসর বয়সে ম্যাসিডন ত্যাগ করে তিনি বেরিয়েছিলেন পৃথিবী অভিযানে। তারপর আর স্বদেশে ফেরেন নি এবং দেশে ফেরার জন্য কখনো যে কাতর হয়েছিলেন এমন প্রমাণও নেই। হয়তো তাঁর মতন মহামানবের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীই স্বদেশ। (পুর্নমুদ্রিত)

ভূত বাংলো

সুশান্তিকা চৌধুরী (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ)

একটি পরিত্যক্ত রাজবাড়ি। যেটিকে বাইরে থেকে পরিত্যক্ত মনে হলেও বাড়িটি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রাজবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এখন মানুষেরা এই বাড়ি 'ভূত-বাংলো' নামেই জানে। কালের নিয়মে সব জৌলুস ফিকে হয়ে গেছে।

এই তো কিছু মাস আগের ঘটনা। এই রাজবাড়ির সামনের মাঠে কিছু বাচ্চা ফুটবল খেলছিল। হঠাৎ তাদের বলটা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রথমে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায় এবং ভাবে থাক ওই বল আর আনতে যাবে না। কিন্তু গরম কাল, সূর্য ডুবতেও অনেক দেরি। তাই ওদের মধ্যে থেকে সুমন বলে উঠল, 'ভূত বলে কিছু হয় না। বাবা-মায়েরা ভয় দেখানোর জন্য এই সব কথা বানিয়ে বলে।' সুমনের কথা শুনেও বন্ধুরা বল আনতে যেতে রাজি হল না। সুমন তাদের অনেক করে বোঝালো, অবশেষে তারা রাজি হল বল আনার জন্য। কিন্তু তারা জানে না তাদের ফুটবলটা বাড়ির কোথায় আছে। বাইরে দিনের আলো স্পষ্ট হলেও রাজবাড়ির ভিতরে মায়াবী অন্ধকার, ঢুকলেই গা ছমছম করে। বাচ্চারা দুই দলে ভাগ হয়ে তাদের বল খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তারা আবার একজায়গায় হল। তারা এমন একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল যেটা সেই বাচ্চাগুলোর কল্পনারও অতীত ছিল। সেই দলের মধ্যে থেকে ছুটি বলে উঠল, 'এতক্ষণ ধরে চক্কর কাটলাম, কিন্তু এখানে এসে দেখি সব উল্টো।' ছুটির কথার রাশ টেনে পুতুল বলল, 'বাড়িটার কোথাও ভেঙে গেছে, আবার কোথাও বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠেছে। আর সেই জন্য কোনো রকম আলো এই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বাড়িটি দিনের বেলায় মায়াবী হয়ে উঠেছে কিন্তু এই ঘরটা এত সুন্দর হল কী করে?' তখন রানা বলে উঠল, 'এটা নিশ্চয় ভূতের ঘর। তাই এত সুন্দর। আর বল খুঁজে দরকার নেই। চল্ পালিয়ে যাই।' সুমন রানাকে ধমকে চুপ করিয়ে বলল, 'ভীতুর ডিম! ভূতের কোনো অস্তিত্বই নেই, সেই ভূত নাকি আবার ঘর সাজাবে। এ নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার।' এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাচ্চাগুলো টেরও পায়নি। হঠাৎই বাচ্চাগুলো কারোর একটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। প্রথমে সবাই খুব ভয় পেয়ে যায়। এইরকম একটা বাড়িতে বাচ্চাগুলো ছাড়া কেউ নেই, তাহলে কে হতে পারে? ছুটি বলল, 'এখন এসব ভাবার সময় নয়, চল কোথাও একটা গিয়ে গা ঢাকা দিই।' বাচ্চাগুলো এতক্ষণ যেটা ভেবে অস্থির হচ্ছিল সেই ভূতের ভয় তাদের ভেঙে গেল। তারা দেখতে পেল কিছু লোক ব্যাগে করে কিছু নিয়ে এসে একটা আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কুট্টুস বলে একটি ছোটো ছেলে মাকড়সায় খুব পায়। কুট্টুস যেখানে লুকিয়েছিল, সেখানে হঠাৎ একটি মাকড়সা তার সামনে চলে আসে। বেচারা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল, এমন সময় ছুটি তার মুখটা চেপে ধরে। লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাচ্চাগুলো আলমারিটা খুলে দেখতেই তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। পুরো আলমারিটাতে সোনা-দানাতে ভর্তি। হঠাৎ কুট্টুস একটা কিছুর আওয়াজ শুনতে পেল। সবাই চুপ করে সেই আওয়াজটা শুনল এবং বোঝার চেষ্টা করল আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। হঠাৎ ছুটি বলল এই আওয়াজ চন্ডীমন্ডপের দিক থেকে আসছে। চল্‌তো ব্যাপারটা গিয়ে দেখি। তারা যখন চন্ডীমন্ডপের দিকে রওনা হল তখন তাদের সামনে হঠাৎ কিছু কঙ্কাল তান্ডব নৃত্য শুরু করে দেয়। ভয়ে সবাই চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু ছুটি খুব চালাক মেয়ে, সে সবাইকে শান্ত করে বলল, 'ভালো করে দেখ, এগুলি প্লাস্টিকের। আমাদের ভয় দেখানোর জন্য এই সব কান্ড করা হয়েছে।' এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাচ্চারা বাড়ি ফিরছে না দেখে বাবা-মায়েরা খোঁজ আরম্ভ করে দিল। তারা পুলিশে খবর দিল। সুমন ও ছুটি খুব সাহসী। তাই তারা বন্ধুদের নজর রাখতে বলল। এবং দুজনে বাড়ির বাইরে বেরোলো তারা দেখতে পেল তাদের বাবা-মা ও পুলিশেরা তাদের খোঁজে এই বাড়ির সামনে চলে এসেছে। সুমন আর ছুটি পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল। পুলিশ তখন পুরো বাড়ি তল্লাশি করে এবং ওই লোকগুলিকে ধরে ফেলে। পরে জানা যায়, লোকগুলি কুখ্যাত ডাকাত। ডাকাতগুলো একটা লুকানো সম্পত্তির খোঁজ পায় আর তার জন্যই এই লোকগুলি ভূতের গল্প রটিয়ে দেয়। পুলিশ এখানে কয়েকশো টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করে। এই বাড়ি এখন সরকারের অধীনে। এটি এখন টুরিস্ট স্পট। এলাকার বেকার ছেলে মেয়ে এখানে গাইডের কাজ করে। সরকার ওই বাচ্চাগুলিকে সাহসী পুরস্কার দেয়। এতে বাচ্চাগুলো যতটা না খুশি তার থেকে বেশি খুশি ওদের বল খুঁজে পেয়ে। এইভাবে ওই বাচ্চাগুলোর নির্ভীক সাহসিকতার ফলে ভূত বাংলার রহস্য সবার কাছে উদঘাটন হল।

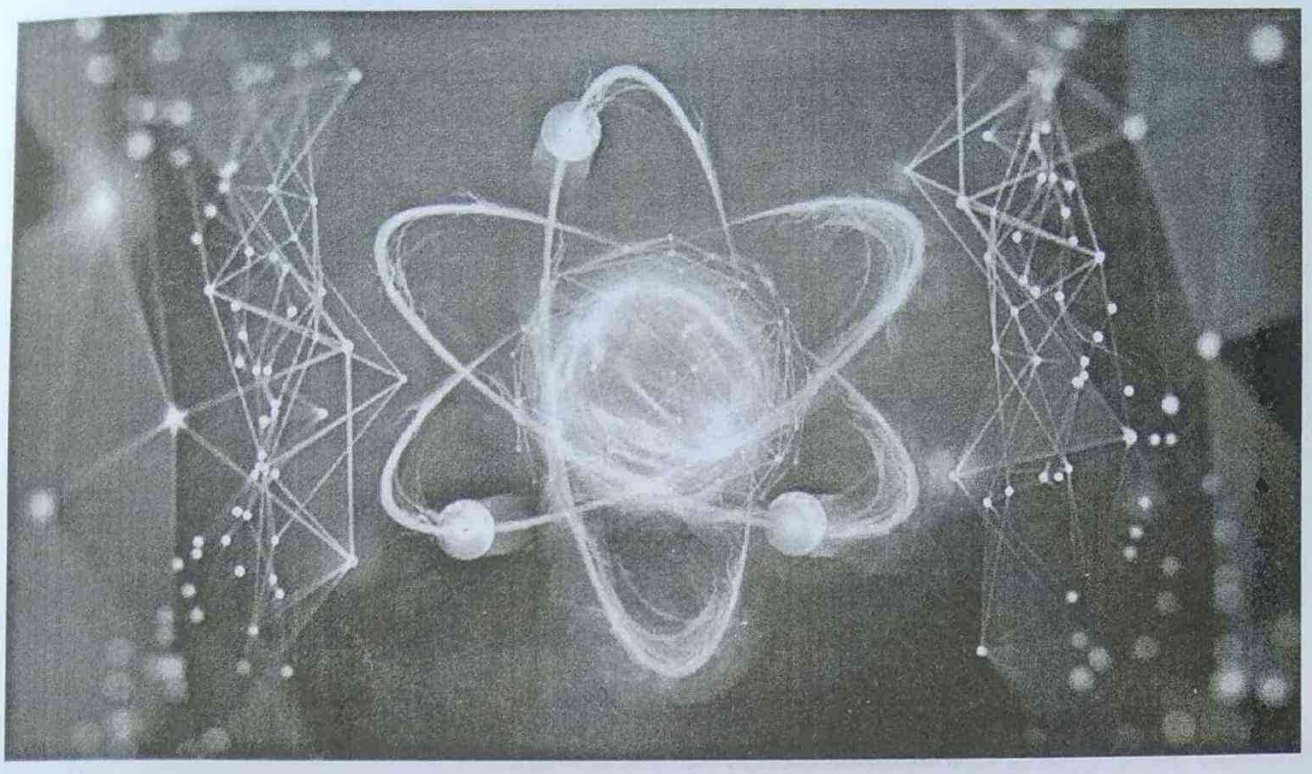

কণা জগৎ ও তাদের কার্যকলাপ

অধ্যাপক নিশিকান্ত পাল (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)

আজ থেকে ১৩০০ কোটি বছর আগে যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, ঐ সৃষ্টি লগ্ন থেকে আজ অবধি যতরকম মৌলিক কণার পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের মোটামুটি দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। একশ্রেণিকে বলা হয় হ্যাড্রণ (Hadron) এবং অন্য শ্রেণিকে বলা হয় লেপট্ন (Lepton), Hadron কথাটি এসেছে heavy বা ভারী কথাটি থেকে, সত্যিই এরা ভারী এবং বলবান (Strong), ফলে এরা নিজেদের মধ্যে খুব তীব্র বল প্রয়োগ করে, যাকে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Strong interaction বা তীব্র পারস্পরিক ক্রিয়া।

অন্য শ্রেণির কণাগুলিকে বলা হয় লেপটন (Lepton), Lepton কথাটি এসেছে Light বা হাল্কা কথাটি থেকে। এরা সত্যিই হাল্কা— Hadron কণাদের তুলনায়, ফলে এরা তুলনামূলকভাবে দুর্বল বা Weak তাই এরা যে বল প্রয়োগ করে তা খুবই দুর্বল প্রকৃতির।

তীব্র বল বা Strong interaction সংঘটিত হয় কেবলমাত্র পরমাণুর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস থাকে তার মধ্যে বসবাসকারী নিউক্লিয়ন (Nucleon) গুলির মধ্যে, অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে তবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রোটিন-নিউট্রনকে আকর্ষণ করে এমন নয়। প্রোটন প্রোটনকে এবং নিউট্রন নিউট্রনকেও তীব্র বলে আকর্ষণ করে। এই বলের প্রকৃতি বেশ অদ্ভুৎ, কেননা আমরা এটুকু জানি যে ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধানকে আকর্ষণ করে বা ধনাত্মক আধানকে এবং ঋণাত্মক আধানে আহিত ও নিউট্রন নিস্তড়িৎ। সুতরাং এই যে তীব্র নিউক্লিয় বল তা আধান নির্ভর নয়, আধান নির্ভর বলকে আমরা বলি কুলম্বীয় বল, বিজ্ঞানী কুলম্বের নাম অনুসারে। যেটি অনেকটাই দুর্বল প্রকৃতির নিউক্লিয় বলের তুলনায়। আবার এটি ভর নির্ভরও নয়। কেননা ভর নির্ভর বল যাকে আমরা স্যার আইজাক নিউটনের নাম অনুসারে বলি নিউটনীয় বল যেটি মহাকর্ষীয় বল বলে বেশি পরিচিত। ওটিও অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির, তাহলে মনে এক প্রশ্ন জাগে এই নিউক্লিয় তীব্র বলের কারণটাই বা কী?

এই কারণ অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে বোঝাগেল এর কারণ হল দূরত্ব, অর্থাৎ যখন এই Hadron কণাগুলো একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে এসে পড়ে তখনই এই ধরণের তীব্র বল অনুভূত হয়, যা আধান বা ভরের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে একটি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই তীব্র নিউক্লিয় বলের মাত্রা যদি আর একটু বেশি হত অর্থাৎ ১ শতাংশ যদি বেশি হত তাহলে প্রোটন কণাগুলো জুড়ে যেত, কোন একক প্রোটন কণা থাকত না ফলে সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদের অভ্যন্তরে কোন Fusion Reaction থেকে কোন শক্তি জ্যোতিষ্কমন্ডলী পেত না। সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদের অভ্যন্তরে দুটি ডয়টেরন মিলিত হয়ে তৈরি করে হিলিয়াম, এই বিক্রিয়ায় ভরের কিছু ঘাটতি ঘটে, এই ঘাটতি ভর আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণের নিয়মানুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এই বিক্রিয়াটিকে আমরা Fusion Reaction বলি, আবার এই বলের

মাত্রা কম হলে প্রোটন নিউট্রনের কাছাকাছি এসে নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারত না, ফলে হয়তো বা তৈরী হত অন্য বিশ্ব (Universe), আমাদের কোন অস্তিত্বই থাকত না, তাহলে ভাবুন সৃষ্টি কর্তার কী অদ্ভুৎ সৃষ্টি কৌশল।

আমরা আগেই বলেছি Lepton কণাগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র দুর্বল শ্রেণির বল অনুভূত হয়। এই দুর্বল শ্রেণির বল আবার তিন রকমের। একটিকে বলা হয় তড়িচুম্বকীয় অর্থাৎ তড়িৎ বল এবং চুম্বকীয় বলের সংমিশ্রণ যেটির আবিষ্কর্তা হলেন বিজ্ঞানী Maxwell. এই তড়িৎচুম্বকীয় বল অনুভূত হয় দুটি সঞ্চরনশীল আহিত কণার মধ্যে, এই বলের প্রভাবে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে ও তৈরি হয় পরমাণু বা Atom যা কিনা সৃষ্টি করেছে মৌল, যৌগ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়া আর একটি দুর্বল শ্রেণির বল হল (দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া) Weak interation জনিত বল এটি তড়িচুম্বকীয় বলের থেকে দুর্বল, যেটি অনুভূত হয় যখন একটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন— প্রোটন অনুপাত সুস্থির হওয়ার জন্য যথাযথ না হয় তখন আমরা তাকে বলি তেজস্ক্রিয় মৌল, এবং তখন নিউক্লিয়াসের ভেতরের একটি নিউট্রন কণা ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি করে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রণের সঙ্গে নিউক্লিয়নগুলির অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়া খুবই দুর্বল হয় যাকে বলি Weak interation ফলে নিউক্লিয়াসটি ইলেকট্রনকে ধরে রাখতে পারে না, তখন নিউক্লিয়াসের ভেতরে তৈরী হওয়া ইলেকট্রন বিপুল বেগে বেরিয়ে যায় নিউক্লিয়াস ছেড়ে, যাকে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় বলি (Beta-decay) বিটা ডিকে, এভাবে অস্থির কণাগুলো ক্রমশঃ সুস্থির হতে থাকে। যদিও এটা বিটা ডিকেতে (B-decay) আমরা বলেছি একটি নিউট্রন ভেঙ্গে তৈরি হয় একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন। কিন্তু শক্তি, ভরবেগ ইত্যাদির নিরিখে বিচার করে প্রমাণিত হয় যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের সঙ্গে আরো একটি কণা তৈরি হয় এই B-decay তে, যেটির পোষাকী নাম অ্যান্টি নিউট্রিনো (Anti neutrino) এটি একটি ভর হীন, আধান হীন শক্তি কনা- যা আলোক কণা ফোটন (Photon) এর সদৃশ। এই Anti neutrino কণা neutrino কণার প্রতিকণা, এই দুটি কণার পার্থক্য হল শুধু এদের ঘূর্ণন (Spin) গতিতে, আমরা জানি পৃথিবী তার নিজ অক্ষে ২৪ ঘন্টায় একবার পাক খায়। যাকে আমরা বলি আহ্নিক গতি, পদার্থ বিজ্ঞানে একেই বলে ঘূর্ণনগতি বা Spin motion এই ঘূর্ণন দু-ধরণের হতে পারে, পৃথিবী নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে অর্থাৎ Anti clock wise spin কিন্তু যদি নিজ অক্ষে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরত তাহলে হত Clock wise spin neutrino এবং Anti neutrino এর মধ্যে সবকিছু একই। শুধু এদের একটির spin Anti clock wise এবং অন্যটির Clock wise spin এরকম বহু কণার প্রতিকণা আছে। আহিত কণার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিকণা গুলোর মধ্যে কেবলমাত্র আধানটি বিপরীত, অন্য সবকিছু অর্থাৎ ভর ইত্যাদি সবই একই। যেমন ইলেকট্রনের একটি প্রতিকণা হল পজিট্রন। ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক কিন্তু পজিট্রনের আধান ধনাত্মক, অথচ ভর দুজনেরই একই। তৃতীয় যে দুর্বল শ্রেণির বলটি আছে তা হল মহাকর্ষ বল। এটি হল দুর্বলতম। বলটি দুর্বলতম হলেও এরই প্রভাবে আমরা সহ পৃথিবীর উপর সমস্ত কিছু পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারছে না, বা পৃথিবী নিজে সূর্য্যকে ছেড়ে পালাতে পারছে না, বরং সূর্যের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে বছরের পর বছর যুগ যুগ ধরে অনবরত: সূর্য্যের চারদিকে বন বন করে ঘুরে চলেছে। শুধু পৃথিবীই বা কেন সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ এই সবচেয়ে কমজোরী বলের প্রভাবেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে, শুধু সৌর জগৎই বা কেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই এই সবচেয়ে কমজোরী মহাকর্ষ বলের প্রভাবে একে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে অনবরত: একে অন্যের চতুর্দিকে ঘুরে চলেছে। যদিও মহাকর্ষ বলের মাত্রা খুবই অল্প কিন্তু এর মান সৃষ্টিকর্তা এমনই স্থির করেছেন যে, যদি এর মান একটু বেশি হত তাহলে জ্যোতিস্কদের ভেতরটা আরো বেশি গরম হয়ে উঠত ফলে হল Fusion Reaction যার প্রভাবে জ্যোতিষ্করা তাপ ও আলো পায় তা আরও তাড়াতাড়ি ঘটত, ফলে নক্ষত্রগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যেত, ফলে গ্রহগুলো কোন সময় পেতনা জীবন সৃষ্টির জন্য, অর্থাৎ আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকত না।

আবার এই বলের মাত্রা যদি আর একটু কম হত— তাহলে পদার্থ কণা জুড়ে গ্রহ, নক্ষত্রের সৃষ্টিই হত না। অর্থাৎ কেবলমাত্র সৃষ্টি কর্তার নিখুঁত হাতেই সম্ভব হয়েছে এই বিস্ময়কর সৃষ্টি।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে চার ধরণের বলের কথা বললাম— (Strong, Electromagnetic, Weak, Gravitational) নিউক্লিয়, তড়িচুম্বকীয়, দুর্বল ও মহাকর্ষীয় এরাই সব রকম পদার্থের গঠন ও পার্থিব সব ঘটনার জন্য দায়ী। যেমন একটি নিউক্লিয়াস গঠনের জন্য দায়ী নিউক্লিয় বল, একটি পরমাণু গঠনের জন্য দায়ী তড়িচুম্বকীয় বল। বড় বড় বস্তু যথা নক্ষত্র ইত্যাদি তৈরির জন্য দায়ী মহাকর্ষ বল। আবার তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলোকে সুস্থির করার জন্য দায়ী দুর্বল বল বা Weak interation জনিত বল।

যদিও এই চার ধরণের বলকে আমরা আলাদা বলে জানি বা ভাবি— নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কিন্তু তা মনে করতেন না, তিনি ভাবতেন এরা একই বলেরই ভিন্ন রূপ অর্থাৎ এই চারটি বলকে একইভূত বা একসঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। যদিও তিনি জীবদ্দশায় একাজ করে উঠতে পারেন নি, পরবর্তী কালে ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম এবং Steven weinbeng তড়িৎচুম্বকীয় এবং দুর্বল (Weak interation) এই দুটি বলকে একইভূত করতে পেরেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে Electro Weak interation এবং এই কাজের জন্য এই দুজন বিজ্ঞানী ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীগণ Standard Model এর চেষ্টা করে চলেছেন Electro Weak এর সঙ্গে Strong interaction কে জুড়ে ফেলবে যাকে বলা হবে Grand Unified interaction. Grand Unified interaction এর সঙ্গে মহাকর্ষ বা Gravitation কে জুড়ে ফেললেই সফল হবে আইনস্টাইনের স্বপ্ন। যাকে বলা হবে Universal Interaction যেটি হবে Theory of everything অর্থাৎ সব কিছুরই গুরু তত্ত্ব।

যদি আমরা এতক্ষণ Hadron কণাগুলোকে Lepton কণাগুলোর মত মৌলিক কণা বলেছি— আমেরিকান বিজ্ঞানী Muray Gell-Mann ১৯৬৩ সালে কোয়ার্ক (quark) আবিস্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধারণা বদলে গেল, জানা গেল Hadron কণাগুলো আসলে কতকগুলো quark এর সমষ্টি। সুতরাং Hadron কণাগুলোকে আর সত্যিকারের মৌলিক

কণা বলা যায় না অন্তত: যতক্ষণ এরা নিউক্লিয়াসে আছে। এই quark গুলো ছ রকমের। Up, Down, Strong, Charmed, Top, Bottom সংক্ষেপে বা সাংকেতিক ভাবে u, d; s,c এবং t, b এরা সবাই আহিত, ধণাত্মক আধানে, তবে এদের আধানের মান ইলেকট্রন আধানের ভগ্নাংশ, কোনটির আধান ইলেকট্রন আধানের এক তৃতীয়াংশ এবং ঋণাত্মক, আবার কোনটির আধান ইলেকট্রন আধানের দুই তৃতীয়াংশ এবং ধনাত্মক, quark গুলোর আবার রং (Color) আছে। কোনটি লাল, কোনটি নীল আবার কোনটি সবুজ, আরো অদ্ভূত যে, এরা বর্ণচোরা, কেননা একটি লাল quark একটি gluon কণা শোষণ করে নীল quark এ পরিণত হয়, আবার ঐ নীল quark টি gluon কণাকে ছেড়ে দিয়ে লাল quark এ রূপান্তরিত হয়। তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে, বাস্তবজগতের রং এর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। quark গুলোর আরো একটি বৈশিষ্ট হল এদের গন্ধ বা flavor আছে। তবে এই গন্ধের সঙ্গে বাস্তব জগতের গন্ধের আদৌ কোন মিল নেই। যাই হোক এবার প্রশ্ন জাগছে যে, নিউক্লিয়াসের দুই অধিবাসী এবং প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ quark দিয়ে তৈরী? পরীক্ষা করে জানা গেছে একটি প্রোটন দুটি up quark এবং একটি down quark দিয়ে আর একটি নিউট্রন কণা দুটি down quark এবং একটি up quark দিয়ে তৈরী। সুতরাং প্রোটন, নিউট্রন আর সত্যিকারের মৌলিক কণা থাকল না। যদিও আমরা Hadron কণা হিসেবে কেবলমাত্র প্রোটন, ও নিউট্রনের কথা বলছি তবে আমাদের জানা আরো বহু Hadron কণা আছে। তাই বিশাল এই Hadron কণা জগৎকে আবার দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, এক শ্রেণিকে বলা হয় মেসন (Meson) এবং অন্য শ্রেণিকে বলা হয় ব্যারিয়ন (Baryon), Meson গুলো একটি quark এবং একটি Anti quark দিয়ে তৈরি এবং Baryon গুলো তিনটি quark দিয়ে তৈরী, এ পর্যন্ত ১৪০টি Meson এবং ১২০টি Baryon পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা Meson হল পাইমেসন (II-Meson), সংক্ষেপে পায়ন (Pion) আর সবচেয়ে হাল্কা Baryon হল প্রোটন। II-Meson ছাড়া আরো অন্যান্য K- Meson বা Kaon (ক্যায়ন), ইটা (Eta) মেসন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রোটন ছাড়া অন্যান্য Baryon গুলো হল নিউট্রন, Lamda (এ) Sigma (E) XI (জাই) Omega ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এই কণাগুলোর প্রত্যেকের প্রতি কণাও (Antiparticle) আছে অর্থাৎ কণা এবং সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রতিকণাদের সংখ্যার হিসেব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আবার আমরা যদি ইলেকট্রনকেই শুধু Lepton কণা বলেছি এই Lepton শ্রেণিতে আবার ইলেকট্রন সহ মোট ছটি Lepton কণা আছে, এরা হল ইলেকট্রন, ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউয়ন (Muon) মিউ নিউট্রিনো টাও (Tau) এবং টাও নিউট্রিনো এদের আবার ৬টি Anti-particle ও আছে।

এবার স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে কণাগুলোর পরিচয় আমরা পেলাম প্রকৃতিতে তাদের কি কোন ভূমিকা আছে? যদিও এই কণাগুলো আমাদের কাছে নিছকই কণা বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতিতে এদের প্রত্যেকেরই আপন আপন ভূমিকা আছে। যেমন আমরা যে চার ধরণের বলের কথা বলেছি তাদের প্রতিটি বলের কারণ কিন্তু এই কণা জগতের কোন না কোন কণার প্রভাবে যেমন নিউক্লিয় বল সংঘটিত হয় পাইমেসন কণার দেওয়া নেওয়ার ফলে, তড়িচুম্বকীয় বলের জন্য নিউক্লিয় বল সংঘটিত হয় ফোটন (Photon) Weak interaction জনিত বলের জন্য দায়ী W এবং Z কণা, মহাকর্ষ জনিত বলের জন্য দায়ী গ্রাভিটন কণা (Gravition) আবার Gluon কণার দেওয়া নেওয়ার ফলে quark গুলো কাছাকাছি এসে তৈরি করেছে (i) প্রোটন ও নিউট্রন। তেমনি প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে পাইমেসন কণার দেওয়া নেওয়ার ফলে প্রোটন নিউট্রনের কাছাকাছি এসে তৈরি করে নিউক্লিয়াস। আবার প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে ফোটন কণা দেওয়া নেওয়ার ফলে তৈরি হয় পরমাণু ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশাল এই কণা জগতের প্রত্যেকটি কণা কোন না কোন কাজে ব্যস্ত, কেউ অনবরত শক্তি জুগিয়ে চলেছে, কেউ কণাদের বল জুগিয়ে চলেছে। আবার কেউ অনবরত কণাদের ভর জুগিয়ে চলেছে, অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আসল শাসন কর্তা হল এই কণা জগৎ। (পুনর্মুদ্রিত)

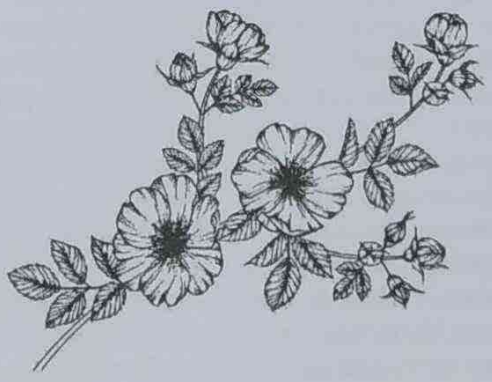

Two Hundred Years of The Permanent Settlement And The Agricultural Field of West Bengal.

Prof. Kishor kumar Roy Chowdhury

Procedures of development of socio-economic advancement in any country depends on the agricltural structure of that country, changes in the agricultural policies again bring about the changes in agricultural structure. It may be discerned in the socio-economic, chronicles of Bengal that various changes took place in the field of land policies from the time of Murshid Kuli Khan until recent times and consequently variegated changes too have been noticed in the economic confluence. In 1793 the Permanent Settlement was established by Lord Cornwalish in Bengal, Bihar, Orissa and Madras. In about twenty five percent of the total area of our country this Settlement was made in Vogue. Two centuries elapsed since that permanent settlement. Significance and importance of the impact and the vast range of changes of this settlement are worth our curious attention.

On analysis of the historical background of the land system of Bangladesh or Bengal it is found that the settlement of land made by Murshid Kuli Khan was much significant from historical and vocial point of view in 1722 a land settlement was established following the 'jabati'system of Todarmal. Under this system Sube Bengal was divided. into 1660 parganas and 13 chaklas, To collect revenue Murshid Kuli Khan sent to every village Amin, Shikdar, Karkoon and Jaripdarah. On behalf of the landlords the etamdar observed the role of the revenue collectors. They collected directly taxes from the peasants and the rayats. During this time the amount of the government revenue increased a lot. According to Sir Jadunath Sarkar the rervenue increased from one crore thirteen lakhs to one crore fifty lakhs.

Murshid Kuli Khan introduced a sort of 'jama' system, consequently a type of jamindar class emerged in Bengal This Jamindar class flourished. Hed even in the later times. In 1728 Nawab Suja Al Din Changed this 'Jama' system and introduced 'sumar' system, but this 'Sumar' system was just a prototype of the 'jama' system. Under this system most of the revenue was collected by the Jamindars. It is noticed that as a result of the 'Jaka' system and the 'Sumar' settlement of the later times a different class of jamindars evolved grandually. It may be stated, therefore, that the emergence on the jamindar class consequnet upon the permanent settlement was initiated by the 'jama' settlement of Murshid Kuli Khan and the 'Sumar' settlement of Sujauddin. Under the permanent settlement the ownership of the land was ofered to the jamindar uner the condition that they would collect revenue and would submit the collection to the Government within a settled time in the year. As a result the peasants were deprived of their long standing ownership of the land and were transformed into the peasant-tenants or the 'rayats'. In this way-in between the state and the peasantry a class of intermedidary owners emerged. According to the initial proposals of the Scottish scholar Alexander Dao in 1770 for the permanent settlement personal rights over land was presumed to increase. Later on the permanent setellement was substantiated and as a result the quantity of revenue from land grandually increased. In 1764-65 the amount of revenue collected was *** 174000; in 1793 it was *** 3091000 and in 1800-01 it was 4.2 million pound. The extent of cultivable land as well as the amount of the revenue went on increasing. But this additional revenue was not invested towards the industrial development of Bengal. Additional income of revenue could utilised as the industrial capital, which was not so done in reality. Virtually the economic structure of Benal, although there were new classifications from the social stand point. Gradual expansion of a middle class was effected side by side with the intermediary owners. This besides some sorts of agriculture-based merchants emerged.

Those who were turned into jamindars at the initial stage conseqnent upon the permanent settlement were of various feudal lords of both the Hindu and Muslim communities, namely the kings of Tripura, Coochbehar, Bishnupur and Birbhum. These besides there were Muslim landlord families like the landlord families of Rajasahi and Dinajpur Virtually persons of revenue collectors; the kings and landlords, were turned into jamindars, although initially this permanent settlement met with failure and as a result many were compelled to sell their jamindars on auction. In this context we can refer to the aristocrat. Jamindars Natore, Nadia, Dinajpur etc. only within twenty

five years after the permanent settlement almost fifty percent of the revenue land was brought to auction. There after that jamindari was purchased by people of the banian, mutsuddi, mahajan and traders class.

Therefore the permanent settlement only helped to give rise to a class of traders-jamindars. Under this condition one hundred bighas of land to form an industrial structure in Bengal, which was possible in Great Britain during the Industrial Revolution. The new jamindars of Bengal engaged themselves in revenue collection and agriculture based business. This besides the wealth they spent in lavishness could be utilised for building up an industrial structure.

In the next stage, after the passing of the 'Tenant Law' in 1859 landed property of this intermediary rayats increased on and the power of the jamindars for increasing taxes was curbed to a great extent. Even after this there was little change in the socio-economic structure of Bengal.

'Land Requisition Act. 1953' was passed in West Bengal after independence. Under this Act. the jamindari system was abolished along with the abolition of the permanent settlement. in 1955 'West Bengal Land Reform Act' was passed. Through a modification of the 'Tenants Act' of 1928 the tenant's right of the long recognished Bargadars was revoked, but under the 1955 Act. that right was reestablished and some arrangements were made for their protection. After wards in 1971 the 'West Bengal Land Reform Act' was modified and in 1978 the new land revenue system was introduced, as a result of which 46 lakhs owners of the agricultural land out of the total 52 lakhs of this state have come out of the sphere of land revenue. In 1978 the 'Operation Barga' programme was introduced. In 1982 there was another set of reform.

It is noticed that after the permanent settlement land policy underwent various changes in Bengal and later in West Bengal. Consquently in matters of ownership of land there were striking changes. Until now amount about 1727 lakhs of farmers in West Bengal land has been distributed. Besides these, where as 60 percent of land in India has gone to the control of the mediocre and upper class cultivators through on the country, in West Bengal only 29 percent of land has come to the control of such cultivators.

So after two hundred years of the Permanent Settlement West Bengal, which is part of the then Bengal, has brought about a change such the field of agriculture. Of course how far this change has become effective in the field of the economic development in West Bengal is a debatable question, although the centralisation of personal ownership has been removed to a great extent.

On analysis it is found that draw backs almost of the same kind in the agricultural structure of the post-Independence West Bengal are discerned as these were found in the agricultural structure of Bengal after the Permanent Settlement. Personal Ownship over land is found yet to a great extent. Despite the abolition of the jaminder class a new kind of intermediary owners has emerged and they are of immense influence until now. Besides the se form economic at and point the cultivators of West Bengal lag far behind of people they are engaged in different economic fields. Moreover, from at and points of many other soci-economic advantages there is a remarkable difference between the town and the villages in West Bengal, and this difference is ever widening.

Multifareous adverse corsscurrents flowed away over Bengal or Bangladesh after the permanent Settlement. Many divisions, political unrest and such other elements hindered the economic uplift of Bengal. In 1905 partition of Bengal under the recommendation of Lord Curzon was the first hindrance to the economic development of Bengal. In 1947 again emergence of West Bengal as a new state of the new Independent Indian Republic became another such hindrance. From 1911 to 1946 the area of Bengal was 2005 70 Square Kilometre with a population of about 6 crores. After 1947 the area of West Bengal became 78000 Square Kilometre with a population of 54485560 as per 1981 census, and now it is about 6 crores. Where as the area of West Bengal is obvisously less than half of the area of the former Bengladesh, the population remains almost the same, although, in the meantime, technological advancements where achieved in the field of agriculture. Yet the industrial advancement in West Bengal having been comparatively less population dependent on agriculture or on land has increased more than of your. But the agriculture productivity in West Bengal is not increasing or, in other words, the increase, if any, has become of negligible rate. Threrefore we can conclude that in this state the real income of the people dependent on agriculture or their standard of living has not been enhanced. As per recent calculation about 62 percent people of this state are dependent on agriculture, where as one third of the wealth produced in this state comes from agricultural field, becomes the productivity of land is yet poor. Almost 63.3 percent of the total land of this state is agricultural land and of this about 36 percent is under irrgation. Land per head is naturalty meagra, something like one third of one hector of land.

Therefore it is worth while suveying what the permanent settlement has taught us or what lesson do we glean from it. Economic welfare can not be shaped out only through changes of land-policies and through shifting of ownership of agricultural land. Side by side with revision of the land-policies a befitting agro-based-industrial structure needs be shaped out. Atleast diminishing pressure from the field of agriculture an unproductive section of the people should be employed to industrial fields. Then alone a well proportioned developing structure can be achieved. The history of the failure of the permanent Settlement has taught us this very lesson, but we the people of West Bengal are making late in accepting that lesson.

Blue Jets-- The Light of hope and anxiety

Dr. Amit Lal Bhattacharya
Assistant Professor (Department of Physics)

A narrowly collimated beams of blue light was discovered unexpectedly over a intense thandar cloud during an aircraft observation. The aircraft flew by University of Alaska along the western end of Arakansas thunderstorm, instrumented with wide angle monochromatic Silicon intensified Target (SIT) Television. The winds were flowing in the speed of 100km/h, marble to baseball sized hail accompanied with heavy rainfall.

It was a few km wide spark of blue light and its velocity was approximately hundred kilometer per second. Several scientists have already tried to explain this Unusual phenomenon in the upper atmosphere and they termed it as 'Blue Jets'.

Its reat scientific nature is still not clear. It is found occasionally during aircraft compaign and propagtes upward from very active thunderstroms. It appears from about 20 km attitude to terminate at an attitude of 40 km.

The energy required for this Tel is originated from intracloud discharges. The electron drifts with a speed of 100 km/s and independent of attitude but really depends on atmospheric pressure. The propagation time of the Jet is of the order of one second. The optical emission from the body of this Jet is coming due to the impact excitation of molecules, making collision of the detached electrons.The blue color comes from the blue and ultraviolet emissions from ionised and natural molecular Nitrogen.

According to a renouned scientist Pasko, 375 columb positive charge accumulation requires ambient electrons produced by cosmic rays coming from space, to generate Blue Jets. Here metastable oxygen makes extremely effective detachment which conserves the created electrons. The electric field in Jet body being very large, the brightness of optical emission is also large.

In 2015, Astornaut A. Mogensen took pictures of Blue Jets from the international space station while flying over the Bay of Bengal. He recorded 245 blue flashes in 160 second at about 40 km above sea level over a thunderstorm with most sensitive camera.

This type of electrical storm may have implications of out atmosphere, saving us from radiation. Each and every Jet transferred energy nearly 10^9 J to stratosphere. Can it be used for the benifit of mankind as alternate huge source of energy?

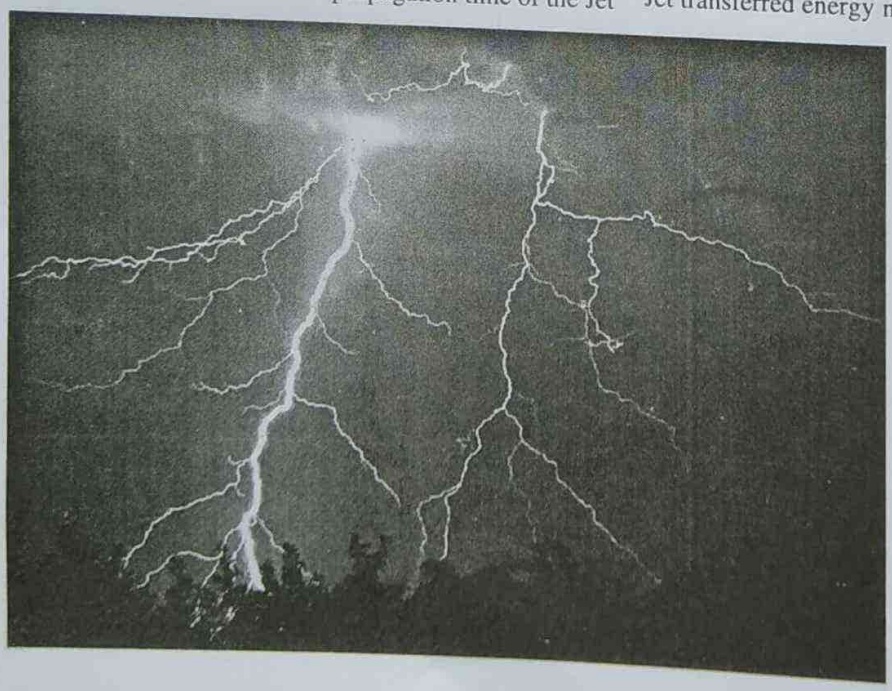

On the otherhand, the long lived by products created by these Jets may harm out atmosphere. Seeing the attitude range, the question is coming in our mind that 'is it affecting the chemical composition of ozone layer?'

Though, presently NASA is taking so many missions from space station to investigate the transient luminous events like Blue Jets at upper atmosphere to clearly understand the physical nature behind the Jets. We hope earliest solution of this mystery.

সন্ন্যাসী নিমাই

মোহন কুমার দাস

আমরা সকলেই জানি নবদ্বীপের মহাপ্রভূ শ্রী চৈতন্যদেবের ইতিহাস যা নিমাই সন্যাস নামেই খ্যাত। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তিনি যুবা বয়সেই গৃহত্যাগ করেছিলেন। এবং তারপরের ইতিহাস তো সোনার অক্ষরে লেখা আছে এবং থাকবে চিরকাল।

কিন্তু আজ আমরা স্মরণ করব অন্য এক সর্বত্যাগী সন্যাসীর স্মৃতি কথা— যার নামও ছিল নিমাই এবং তিনিও খুব অল্প বয়সেই, আক্ষরিক অর্থেই এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন মানব সেবার উদ্দেশ্যে। এই সন্ন্যাসী নিমাইয়ের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা থেকে সহজেই অনুমেয় সাধারণভাবে জীবন-যাপন বা সংসার প্রতিপালন করার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি, হয়েছিল শুধুমাত্র মানুষের সেবা করার জন্য এবং তাতে তিনি সার্থকও হয়েছিলেন।

আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। দেশ ভাগ হওয়ার পূর্বেই পিতৃপুরুষগণ প্রথার সুবিধা গ্রহণ করে জমি জায়গা পেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমন্ডী ব্লকের একটি গ্রামে নাম মহীনাল। বাবা শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ স্বল্প শিক্ষিত নিতান্তই মধ্যবিত্ত ছোট দোকানদার। মা তরুবালা ঘোষ সাধারণ গৃহবধূ। তাঁদেরই দুই পুত্র নিমাই ও কানাই— আর চার কন্যা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জেষ্ঠ্যপুত্র নিমাইয়ের বাল্য বয়স থেকেই একটু অন্যপ্রকৃতির— তা পরিবারের সকলের নজর এড়ায়নি। তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত মিশুক এবং অবশ্যই ভবঘুরে বা ভ্রমণ বিলাসী। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠ সেরে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে। দেশের এ প্রান্ত ও প্রান্ত অনেক ঘুরে ফিরে তিনি হাজির হলেন অধুনা ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে। কী যে খেয়াল হল এখান-ওখান থেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করে ভর্তি হয়ে গেলেন ওখানকার এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি। অচিরেই নজর কেড়েছিলেন কর্তৃপক্ষের। ফলে প্রায় অবৈতনিক ছাত্র হিসেবেই সেখান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা লাভ করেছিলেন। লেখাপড়া করার সুবাদে কয়েক বছরের জন্য সেখানে থিতু হয়েছিলেন। কিন্তু পাশ করার পর আবার তার মন যেন উড়ু উড়ু। সেখানকার আদিবাসী এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে আদিবাসী সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেরেছিলেন তিনি। তখন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল আদিবাসী উন্নয়নের স্বপ্ন। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি বা সঙ্গে সঙ্গে সার্থকও হয়নি। কিন্তু দীন, হীনদের কাছে থেকে দেখার নেশায় তিনি আবার বেরিয়ে পড়েন অজানা উদ্দেশ্যে। পৃথিবী গোল— তাইতো ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আবার গ্রামের বাড়ীতে এসে পৌঁছালেন। অসুস্থ হয়ে সারা শরীরে ঘা, ক্ষত প্রভৃতিকে সঙ্গী করে। কিছুদিন রোগভোগের পর মায়ের সেবাশুশ্রুষাতে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু এবারে মা-বাবা যেন তাঁকে বেঁধে রাখলেন বাড়ীতে— কিছুতেই আর কোথাও তাকে যেতে দেওয়া হবে না— এই ফরমাসও জারি হয়ে গেল। তখন কী আর করেন। অবশেষে স্থানীয় কুশমান্ডি ব্লকে একটি সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন তিনি। কিন্তু সে তো কয়েকটি বছরের জন্য। চাকরী করতে করতেই তাঁর মাথায় এসেছিল নিজে কিছু একটা করবে— যাতে আরও দশজনের কর্মসংস্থান হতে পারে। কিন্তু তার জন্য তো পুঁজি দরকার। কে দেবে পুঁজি? আবার বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে। এবার উদ্দেশ্য কোলকাতা। ঘটনাচক্রে যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা হয় বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের পরিবারের সঙ্গে। তাঁদেরই সাহায্য সহযোগিতায় শুরু করেন জাহাজের যন্ত্রাংশের কারখানা। কিছুদিন খুব ভালো কাজও চলে। এই সময়েই একটি পথদুর্ঘনায় তিনি পায়ে একটি গভীর চোট পান যা পরবর্তীতে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

কিন্তু এখানেও তাঁর অবস্থান বেশীদিন স্থায়ী হল না। এখনকার সব পাট চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভবঘুরে নিমাই, নিমাই। তাঁকে যে বহির্জগৎ ডাকছে— নিশিডাকের মত। তাঁর কি এই বাঁধাধরা জীবন যাত্রায় মন টিকে? এবারে বেরিয়ে পড়লেন--- বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের

উদ্দেশ্যে। সাধারণ মানুষকে আরও কাছে থেকে দেখেন এই প্রত্যাশায়। তাঁর রক্তে যে বইছে ভবঘুরের নেশা। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে মানবসেবার দিকে তাঁর মন ঝুঁকে পড়ে। এই সময়েই তাঁর যোগাযোগ ঘটে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের সঙ্গে। এই মহান সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে তিনি অনুধাবন করেন, চর্চা করেন এবং অনুপ্রাণিত হন যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শ বাণী এবং উপদেশে। ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে তাঁর জীবন ধারা। গুরু মহারাজই তখন তাঁর একমাত্র আশ্রয়। শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের সেবক হিসেবে নিজেকে যুক্ত করে তিনি ধন্য হন। তখনই যোগ দেন ভারত সেবাশ্রম সংঘে ব্রহ্মচারীরূপে নিমাই মহারাজ নাম নিয়ে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী বর্তমানে যিনি সঙ্ঘের সহ-সভাপতি পদে আসীন, পরমপূজনীয় শ্রীমৎস্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর উদ্যোগে কতিপয় তরুণ ব্রহ্মচারীও স্থানীয় কয়েকজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অরঙ্গাবাদ শাখা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠাকালে কয়েকজন তরুণ ব্রহ্মচারীর কর্মতৎপরতা স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল— তাইতো সেই চারাগাছ আজ মহীরূহে পরিণত। এই তরুণ ব্রহ্মচারীদলে ছিলেন কার্ত্তিক মহারাজ, বাদল মহারাজ, সুরেন মহারাজ, বিশ্বনাথ মহারাজ প্রমুখ।

আজ নিজনিজ কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আরও ছিলেন আলোচ্য নিমাই মহারাজ। পরে তিনি সন্ন্যাসপ্রাপ্ত হয়ে স্বামী সনাতনানন্দজী নাম নিয়ে সারা ভারত হিন্দু মিলন মন্দিরের সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এবং ক্রমশই তাঁর কর্মকুশলতার ফলে আরও বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের কান্ডারী হয়ে ওঠেন।

অরঙ্গাবাদ আশ্রমে তাঁর বিভিন্ন কর্মধারার সহযোগী হওয়ার সৌভাগ্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল— সমাজসেবায় তিনি মাটির মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন— সে জন্য তিনি ছিলেন সর্বগুণ— প্রিয়। আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শ, মহাবাণী ও মহাভাবনা সঙ্ঘের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত করবার জন্য সবরকম কর্মযজ্ঞে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। বহু মানুষের দুরুহ সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর পরামর্শ বিশেষ কাঙ্খিত ছিল। প্রতিবেশিদের আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। যেকোন অঘটন, দুর্ঘটন, দৈব-দুর্বিপাক প্রভৃতি বিপদ-আপদে অবিলম্বে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। এলাকায় বারংবার বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের কাছে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষুধ প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজের নির্দেশে, নৌকাযোগে সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর সহযোগিদের সঙ্গে অকুস্থলে পৌঁছেছেন। এতদ্অঞ্চলে যখন সাধারণ পরিবারের সংকটাপন্ন রোগীকে জঙ্গীপুর বা বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার কোন সুব্যবস্থা ছিল না— সেই সময় বহুমানুষের সাহায্য সহযোগিতায় তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য শুরু করেছিলেন মোটর ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল, দুঃস্থ রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় প্রভৃতি। এই রকম আরও অনেকরকম সমাজসেবা কাজে তিনি নিজেকে সর্বদা যুক্ত রেখেছেন অথবা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক কাঁটা, বাধা-বিপত্তিকে অবলীলায় অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে চলেছেন মানুষের সেবায়— নিরলস পরিশ্রম করে।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নিমাই মহারাজের অদম্য স্পৃহা আগ্রহের কথা আজ সর্বজন বিদিত। শুরুতে মাত্র ১৫০ জন শিশু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বিশিষ্ট প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ। নিমাই মহারাজের সুপরিকল্পনাপ্রসূত পরিচালনার ফল স্বরূপ আজ প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ ফুলে-ফলে পূর্ণবিকশিত এলাকায় সাড়া জাগানো একটি বিশেষ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ছাত্র সংখ্যাও বর্তমানে প্রায় হাজার দেড়েক। তাছাড়া প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ-এর প্রাথমিক বিভাগ থেকে মাধ্যমিক বিভাগে উন্নীতকরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভও তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। আর এবার শুরু করেছেন অদুরেই ফতুল্লাপুরে, হাজারপুর এবং ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের শাখা সংগঠন। এইসব বিদ্যাপীঠগুলি পরিচালনার শীর্ষে থাকলেও ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা শিক্ষাকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাছের মানুষ।

আজ থেকে ৪৮ বছর আগে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ অরঙ্গাবাদ আশ্রমে শ্রী শ্রী বাসন্তী দুর্গাদেবী পূজা ও বাৎসরিক হিন্দুধর্ম শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন-এর সূচনা করেছিলেন। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পী এইসব সম্মেলন এবং মহোৎসবগুলিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অত:পর এই বিশাল বাৎসরিক মহোৎসব সংগঠিত এবং পরিচালনার ভার বর্ত্তায় স্বামী সনাতনানন্দজী তথা নিমাই মহারাজের উপর। তিনিও অত্যন্ত উৎকর্ষতার সঙ্গে এই উৎসব পরিচালনায় সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর সহযোগিদের সাহচর্য্যে। বলা বাহুল্য ২০০৪ সালে 'সঙ্ঘশ্রী' স্মরণিকার সৃষ্টির মূল হোতা তিনিই। কিন্তু এই প্রিয়জনকে বেশিদিন আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। কালের অমোঘ নিয়মে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ৭০ বছর বয়সে গত ২০১৬ সালের ১১ই মে আমাদের ছেড়ে শ্রীগুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরকম এক নিকট আত্মীয়ের প্রয়াণে এলাকার সব শ্রেণির মানুষই শোকাহত, মর্মাহত। উল্লেখ্য, স্থানীয় শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান Anglel's Academy গত ২০১৭তে তাঁদের বার্ষিক মিলনোৎসবে সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসারে অনন্য অবদানের জন্য প্রয়াত শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দজী মহারাজকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

জন্মালেই মরতেও হবে— এটাই শাশ্বত নিয়ম। তবু কিছু মানুষের স্মৃতি অক্ষয় অমর হয়ে থাকে তাঁদের অবিস্মরণীয় কর্মের জন্য। নিমাই মহারাজকে আমরা হারিয়েছি ঠিকই— কিন্তু তিনি যেমন ছিলেন সর্বদা তেমনি আছেন এবং থাকবেন আমাদের অন্তরে চিরকাল—

'অজো নিত্য শাশ্বতহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।

—'এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন, শরীরকে হনন করলেও ইনি নিহত হন না।'— এই আমাদের সান্ত্বনা।

তথ্যসংগ্রহ ও ঋণস্বীকার
শ্রীমতি রমা ঘোষ (প্রয়াত স্বামীজীর পূর্বজন্মের নিকট আত্মীয়া)

জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উদ
লাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উদ
50
YEARS

DUKHULAL NIBARAN CHANDRA COLLEGE